আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত তথা
মাসলাকে আলা হযরত-এর মুখপত্র

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

মাসিক পত্রিকা

আল্-মিসবাহ

August
2024

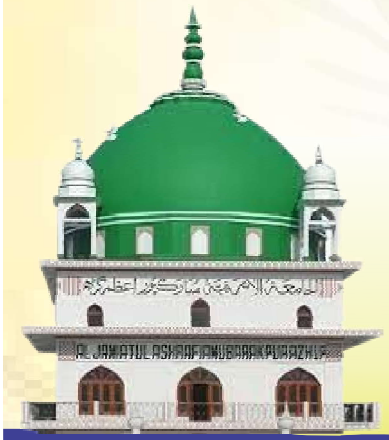

প্রকাশনায়

সুন্নী ইসলামিক মিশন

হেড অফিস-
আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া
(মুবারকপুর, আজমগঢ়, উত্তর প্রদেশ)

পরিচালনায় :-WB MISBAHI NETWORK

স্মরণার্থে

জালালাতুল ইলম,
হুযূর হাফিযে মিল্লাত
রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাক্কিকে মাসায়েলে জাদীদাহ হযরত আল্লামা **মুফতী মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন** রেজবী বারকাতী মিসবাহী
(শাইখুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ.পি.)
আদীবে শাহীর আল্লামা **মুফতী শাহযাদ আলম** মিসবাহী রেজভী
(শাইখুল আদব জামিয়াতুর রেযা, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী আব্দুল খালিক্ব** সাহেব
(প্রধান শিক্ষক জামে আশরাফ কিছৌছা শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী অয়েযুল হক** হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা, পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা
হযরত আল্লামা **শাহজাহান আলম** আযীযী
শাইখুল হাদীস চান্দপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।
মুফতী **মকবুল আহমদ মিসবাহী** দঃ২৪পরগনা
হযরত আল্লামা **মুফতী যুবায়ের আলম** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
হযরত আল্লামা **মুফতী আলিমুদ্দিন** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
আল্লামা **ডাঃ সাজ্জাদ আলম** মিসবাহী
আল্লামা **ডাঃ সাদরুল ইসলাম** মিসবাহী
আল্লামা **আব্দুর রহীম মিসবাহী,** মালদা
মুফতী **ফজলুল রহমান** মিসবাহী
মুফতী **আমজাদ হুসাইন সিমনানী,** দঃ দিনাজপুর
মুফতী **আব্দুল আজীজ কালিমী,** মালদা
মুফতী **লতফুর রহমান মিসবাহী আজহারী,** মালদা
মুফতী **শাহজাহান,** বীরভূম
মুফতী **আলী হুসাইন** তাহসীনী
মুফতী সাবির আলী মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরাম

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী রফীক আলম মিসবাহী, মালদা
সিনিয়র শিক্ষক মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী মঈন উদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ
হেড শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়
জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালীমিয়া আরবী ইউনিভার্সিটি,
সাইদা পুর, মুর্শিদাবাদ।

মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম
শাইখুল হাদীস মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

সদস্য মন্ডলী

মুফতী রাফিক আলম মিসবাহী	মুফতী জয়নুল আবেদীন মিসবাহী
মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী	ক্বারী সৈয়দ মাজহারুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী মুক্বসিদ মিসবাহী	মাওলানা আলী রেযা মিসবাহী
মুফতী আফতাব আলম মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল মাবুদ মিসবাহী
মুফতী মঈনুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা আকবর আলী মিসবাহী
মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	মাওলানা গোলাম গৌস মিসবাহী
মুফতী সুলতান আলী মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল কাবির সাহেব
মুফতী সাহীমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী	মাওলানা মুস্তাক্বীম রাজা মিসবাহী
মুফতী হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা দাতা মাহবুব মিসবাহী
মুফতী আতাউর রহমান মিসবাহী	মাওলানা ইনজেমা-মুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী গুলাপ হুসাইন মিসবাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মিসবাহী
মুফতী আলামিন মিসবাহী	মুফতী নুরুল ইসলাম
মুফতী মুঈজুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা শামীম আখতার মিসবাহী
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম মিসবাহী	মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী
মুফতী আসমাউল হক্ব মিসবাহী	মাওলানা সুলাইমান মিসবাহী
মুফতী বিলাল হুসাইন মিসবাহী	সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
মুফতী আবু বকর মিসবাহী	মুফতী মেহেরবান আলী
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	সৈয়দ গোলাম মুসতারশিদ আল-ক্বাদরী
মাওলানা মোমিন আলী মিসবাহী	মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
মুফতী গোলাম মুস্তাফা মিসবাহী	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মারকাযী
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী	ক্বারী সাজিদুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী মারজান মিসবাহী	মুফতী মুসলিম আলী
মুফতী মুতিউর রহমান মিসবাহী	ক্বারী স্বয়নুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী	জনাব শাহিদুল ইসলাম সাহেব
মুফতী তৌহীদুর রহমান আলাঈ জামেঈ	হাফিজ মেহেদী হাসান সাহেব
মাওলানা দাউদ আলম মিসবাহী	মাওলানা নাসির শেখ মিসবাহী
ক্বারী সাজিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয মুস্তাকিম	মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী
মাওলানা গুলাম মুস্তফা	মাওলানা মাসউদুর রহমান
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম রেজবী, ঝাড়খন্ড	মুফতী আবুল কালাম আজাদ, মুর্শিদাবাদ
মুফতী আবরার আলম মিসবাহী	মুফতী সাবির মিসবাহী
ক্বারী আমির সোহেল মিসবাহী	ক্বারী মুনিরুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয তারিক রেজা	মাওলানা কুরবান সেখ মিসবাহী
মুফতী মেরাজ রেজা আসবী	মাওলানা মিনসারুল শেখ মিসবাহী
মাওলানা কলিমুদ্দিন মিসবাহী	ক্বারী ইউসুফ সেখ আমজাদী
মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম মিসবাহী	আনিসুর রহমান
মাওলানা নূর মোহাম্মদ মিসবাহী	তাহসীন রেজা
মাওলানা ইসমাঈল সেখ মিসবাহী	ইমাম হোসেন

সূচীপত্র

	বিষয় ও লেখক	পৃষ্ঠা নং
1	ইলমে হাদীসে হুযূর আলা হযরতের পান্ডিত্য মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর	2
2	আমরা ইমাম হুসাইনের গোলাম বলা কি শির্ক? মুফতি গোলাম মাসরুর আহমদ মিসবাহী, ঝাড়খণ্ড	6
3	হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব (পর্ব ২) মুফতি শামসুদ্দোহা মিসবাহী, দঃ চব্বিশ পরগনা	10
4	জিকিরের গুরুত্ব কোরআন ও হাদীসের আলোকে সৈয়দ সামিরুল ইসলাম, হুগলি	16
5	প্রশ্নোত্তরে ওযুর ১৫ টি মাসায়েল মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ	19
6	সহীহ হাদীসের সহজ সরল ব্যাখ্যা মাওলানা হেশামুদ্দিন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ	22
7	জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার বিধান মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মালদা	27
8	ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে আপত্তি ও তার জবাব (পর্ব ২) মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম	34
9	হুযুর আলা হযরতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী, দঃ চব্বিশ পরগনা	40
10	হায়েয ও নিফাস সম্পর্কিত মাসায়েল মাওলানা হাশিমুদ্দীন মিসবাহী, বীরভূম	44
11	পীরের নিকটে বায়আত হওয়া কি ওয়াজিব? মাওলানা কলিমুদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ	47

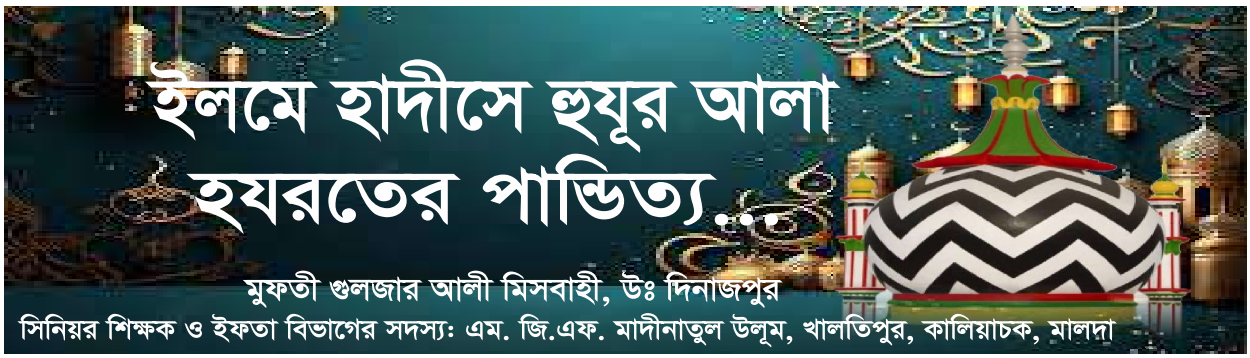

ইলমে হাদীসে হুযূর আলা হযরতের পান্ডিত্য...

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য: এম. জি.এফ. মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় যুগের অতুলনীয় ফক্বীহ ছিলেন। ফিক্বহ শাস্ত্রের ইনসাইক্লোপিডিয়া "ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ" হল তার জলন্ত প্রমাণ। ফিক্বহ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য দেখে **হযরত শায়খ সৈয়দ মুহাম্মদ ইসমাঈল মাক্কী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:**

"যদি এই গবেষণা টি ইমাম আযম আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখতেন, তাহলে তাঁর চক্ষু ঠান্ডা হয়ে যেত এবং নিশ্চিতরূপে এর লেখককে (আলা হযরতকে) নিজের ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করতেন।"

(আল ইজাযাতুল মাতীনাহ লি ওলামায়ি মাক্কাতা ওয়াল মাদীনাহ, পৃঃ ২৫৯, প্রকাশিত লাহোর)

হযরত সাদরুল আফাযিল সৈয়দ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

"ফিক্বহ শাস্ত্রে (আলা হযরত)-এর জ্ঞানের গভীরতাকে দেখে মক্কা-মদীনা সহ সারা বিশ্বের আলিমগণ নিজ নিজ মাথা নত করে তাঁর সমর্থন করেছিলেন। বিস্তারিত তাঁর ফাতাওয়া দেখেই বুঝা যায়। কিন্তু সংক্ষেপে দুটি শব্দে আমি বলি যে, তিনি বর্তমান শতাব্দির দুনিয়ার মধ্যে এমন একজন মুফতী ছিলেন যার দিকে গোটা বিশ্বের মানুষ নবঃউদ্ভাবিত মাসআলা-মাসায়েল সমূহ, বিশেষ কোন বিষয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য দারস্ত হতেন। একটি কলম ছিল, যে সারা বিশ্বের ফিক্বহের ফায়সালা প্রদান করত। তিনিই বদ মাযহাবের জবাব লিখতেন। বাতিল পন্থিদের কিতাবসমূহের খন্ডন করতেন। আর বিশ্বের মানুষের প্রশ্নের জবাবও দিতেন। আলা হযরতের দক্ষতা তাঁর বিরোধীরাও সমর্থন করেছেন যে, "ফিক্বহ শাস্ত্রে তাঁর নমুনা চক্ষু দেখেনি।"

(হায়াতে সাদরুল আফাযিল)

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিক্বহ শাস্ত্রে পান্ডিত্য দেখে তাজুল উলামা, সৈয়দ শাহ আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ মিঞা ক্বাদরী বারকাতী (সাজ্জাদাহ নশীন খানকাহে মারেহরা মুতাহহারা রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলতেন:

"আমি আলা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহকে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমতুল্লাহি আলাইহির উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। কেননা, যে গভীরতা আলা হযরতের মধ্যে আছে, তা ইবনে আবেদীন শামির মধ্যে ছিল না।" (ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলমো দানিশ কি নাযার মে, পৃঃ২৬)

ডঃ ইকবাল বলেন:

"তিনি খুবই মেধাবী এবং বিচক্ষণ আলিমে দ্বীন ছিলেন। ফিক্বহ শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য খুবই উঁচু পর্যায়ের ছিল। তাঁর ফাতাওয়া অধ্যায়ন করে বুঝা যায় যে, তিনি ইজতিহাদের মর্তবায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় ফক্বীহ ছিলেন। হিন্দুস্থানের শেষ যুগে তাঁর মতো মেধাবী ও প্রতিভা সম্পন্ন ফক্বীহ পাওয়া খুবই কঠিন।" (পায়গামাতে ইয়াওমে রেযা, অংশ: ৩, পৃঃ:১০)

এ ছাড়া আরও অসংখ্য আলিম, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস, তাঁর ফিক্বহ শাস্ত্রের অতুলনীয় দক্ষতাকে সমর্থন করেছেন। সবার উক্তি এখানে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

এক কথায় ওলামায়ে কেরাম নিজের মনোভাব উপস্থাপন করে বলেন যে, যুগ যুগ ধরে অখন্ড ভারতের বুকে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত কোন ফক্বীহ জন্ম গ্রহণ করেননি।"

(ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলমো দানিশ কি নাযার মে, পৃঃ ২৪)

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যে, ফক্বীহ হওয়ার জন্য হাদীস শাস্ত্রের কত বড় পন্ডিত হওয়া জরুরী। কেউ তখনই ফক্বীহ হতে পারে যখন হাদীস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকবে। কেননা, মাসআলা-মাসায়েল বা ফিক্বহ শাস্ত্রে গবেষণা ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকেই করতে হয়। ইলমে হাদীসে দক্ষতা না থাকলে ফক্বীহ হওয়া অসম্ভব।

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, যেরূপভাবে তিনি একজন বড় ফক্বীহ ছিলেন তদ্রুপ তিনি বিশাল বড় মুহাদ্দিসও ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রেও তাঁর যুগে কেউ তাঁর সমতুল্য ছিল না।

মনে রাখা উচিত মুহাদ্দিস হওয়া চাট্টি খানি কথা নয়, বরং ইলমে হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের মালিক হওয়া জরুরী। মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য যেসব জ্ঞান রাখা জরুরী তা নিম্নরূপঃ

(১) হাজার হাজার হাদীস অধ্যয়ন করা

(২) উসূলে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

(৩) হাদীসের সূত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া

(৪) আসমাউর রেজাল অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে জ্ঞান রাখা

(৫) জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে অবগত হওয়া

(৬)তাখরীজে হাদীস সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ইত্যাদি।

এ মর্মে আমরা যখন হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর লিখিত কিতাবসমূহ, তাঁর ফাতাওয়া এবং তাঁর গবেষণা পরিলক্ষিত করি তখন বুঝতে পারি যে, উপরোক্ত প্রত্যেক টি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান গরিমা সমুদ্রের ন্যায় ছিল। তিনি ইলমে হাদীস, উসূলে হাদীস, আসমাউর রেজাল, তাখরীজে হাদীস, সনদে হাদীস, ই'লালে হাদীস ও মুসতালাহাতে হাদীস অর্থাৎ হাদীস শাস্ত্রের পারিভাষিক সংখ্যা সমূহ সম্পর্কে অতুলনীয় জ্ঞান রাখতেন।

নিম্নে তাঁর কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল।

হাদীস অধ্যয়নে আলা হযরত

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেউ প্রশ্ন করেন যে, কোন কোন হাদীসের কিতাব আপনার পঠনপাঠনে রয়েছে? এর উত্তরে তিনি বলেন: পঞ্চাশেরও অধিক হাদীসের কিতাব আমার পঠনপাঠনে রয়েছে। যেমন-

মুসনাদে ইমামে আযম, মুয়াত্তা ইমামে মুহাম্মদ, কিতাবুল আসার (ইমাম মুহাম্মদ), কিতাবুল খেরাজ (ইমাম আবূ ইউসুফ), কিতাবুল হিজাজ (ইমাম মুহাম্মদ), শারহু মায়ানিল আসার (ইমাম তাহাবী), মুয়াত্তা ইমামে মালিক, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, মুসনাদে ইমাম মুহাম্মদ, সুনানে দারেমী, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ,খাসায়িসে নাসায়ী, মুনতাক্বী (ইবনুল জারুদ),যু ই'লাল মুতানাহিয়াহ, মিশকাত, জামে কাবীর, মাজে সাগীর, মুনতাক্বা (ইবনে তাইমিয়া), বুলুগুল মারাম, আমালুল এউমিল লাইলাহ (ইবনুস সুন্নী), কিতাবুত তারগীব, খাসায়েসে কুবরা, কিতাবুল ফারজ বা'দাস শিদদাহ, কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত প্রভৃতি পঞ্চাশ (৫০) থেকেও অধিক হাদীসের কিতাব আমার পঠনপাঠনে রয়েছে। (ইযহারুল হক, পৃষ্ঠা ১৯,২০, রেযা একাডেমি মুম্বাই)

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস অধ্যয়ন সম্পর্কে হুযূর মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

"ইলমে হাদীসে তাঁর কত দক্ষতা ছিল এটা এইভাবে অনুমান করতে পারেন যে, (হাদীসের মধ্যে) ফিক্বহে হানাফীর যত দলীল রয়েছে, সবসময় তাঁর নজরের সামনে থাকত। বাহ্যিক রুপে যে সমস্ত হাদীস ফিক্বহে হানাফীর বিপরীত যেত তার বর্ণনার মধ্যে (সূত্র অথবা বর্ণনাকারীর মধ্যে) যে ত্রুটি রয়েছে তা সবসময় নজরের সামনে থাকত।"

(জামেয়ুল আহাদীস, খন্ড :১, খন্ড: পৃষ্ঠা ৪০৭)

এটা তো ছিল তাঁর পঠনপাঠনের বিষয় কিন্ত উনি স্বীয় কিতাবসমূহের মধ্যে যেসব হাদীসের কিতাবাদি হতে দলীল প্রদান করেছেন

তার সংখ্যা চার শত হাদীসের কিতাব থেকেও অধিক।

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ হানীফ রেজবী মিসবাহী বলেনঃ

"আমি যখন খোঁজাখুঁজি শুরু করি তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত ইমাম আহমদ রেযার সাড়ে তিন শত কিতাব এবং প্রবন্ধ (পুস্তিকা) - এর মধ্যে প্রায় তিনি চার শত (৪০০) হাদীসের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে পবিত্র হাদীসসমূহ পেলাম।" (জামিউল আহাদীস ৪০৯-৪১০, বারকাতে রেরা গুজরাট)

এর মানে হল ৫০ টি হাদীসের কিতাব ছাড়া আরও শত শত হাদীসের কিতাবে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাঁর ছিল।

উসূলে হাদীসে পান্ডিত্য

উসূলে হাদীস সম্পর্কে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত কিতাব "আলহাদুল কাফ ফি হুকমিদ দ্বিয়াফ" পাঠ করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায়।

উক্ত কিতাবে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, কোন হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের لا يصح বললেই সেই হাদীস যঈফ হয়ে যায় না। কেননা, সহীহ হাদীসের বিপরীতে যঈফ নয় বরং হাসান লি যাতিহী ও হাসান লি গাইরিহী বিদ্যমান। সুতরাং কোন হাদীসের সহীহ হওয়াকে অস্বিকার করা মানে তার যইফ হওয়া জরুরী নয়।

অনুরূপভাবে তিনি উক্ত কিতাবে হাদীসের সংজ্ঞাসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইলমে হাদীস ও উসূলে হাদীসে তাঁর দক্ষতা দেখে হযরত আল্লামা আব্দুল মুজতাবা সাহেব বলেন:

"আমি সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি যে, এ যুগের বড় বড় মুহাদ্দিসগণ, দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান আলিমগণ যদি ন্যায়পরায়ণের সঙ্গে (উসূলে হাদীস ও ইলমে হাদীস সম্পর্কে) তাঁর গবেষণাগুলো দেখে নেয় তাহলে নিজেদের সম্পূর্ণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা ভুলে গিয়ে মুহাদ্দিসে আকবর ইমাম আহমদ রেযা কুদ্দিসা সিররুহুর ছাত্র হওয়াকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবে।" (তাযকেরায়ে মাশায়েখে রেজবীয়া ক্বাদরীয়া ৪১২)

উসূলে হাদীস প্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত ছয়টি কিতাব রচনা করেছেন।

(১) আলহাদুল কাফ ফি হুকমিদ দ্বিয়াফ (উর্দু)

(২) মাদারিজু তাবক্বাতিল হাদীস (আরবী)

(৩) আল ফাযলুল মাওহুবী ফি মানা ইযা সাহহাল হাদীসু ফা হুয়া মাযহাবী (উর্দু)

(৪) আল- ইফাদাতুর রাযাবিয়াহ (আরবী)

(৫) শারহু নুখবাতিল ফিকর (আরবী)

(৬) হাশিয়া ফাতহুল মুগীস (আরবী)

হাদীসের সূত্রে পান্ডিত্য

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসওয়াক সম্পর্কে একটি হাদীস নকল করেন।

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى أَوْ عَلَى النَّاسِ-لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

او عند كل صلوٰة وعند النسائى فى رواية عند كل وضوء

অর্থাৎ: যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে দাঁতন করার আদেশ দিতাম। ইমাম নেসায়ীর বর্ণনায় রয়েছে প্রত্যেক ওযু করার সময়।

এর পরে হাদীসের রেফারেন্স দিতে গিয়ে বলেন: হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। একাধিক বর্ণনাকারী বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন-

(১)১-ইমাম মালিক ২-ইমাম আহমদ ৩-৮ সিহাহে সিত্তার ইমামগণ হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(২) ৯-ইমাম আহমদ ১০-আবূ দাউদ ১১ নাসায়ী ১২-তিরমিযী-১৩যিয়া হযরত যায়েদ বিন খালিদ হতে বর্ণনা করেছেন।

(৩)১৪- ইমাম আহমদ বিশ্বস্ত সূত্রে হযরত উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেছেন।

(৪)১৫- ইমাম আহমদ ১৬- ইবনে খিসমাহ ১৭-

ইবনে জারীর উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণনা করেছেন।

(৫) ১৮- বায্'যার ১৯-সামউয়াহ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(৬) ২০-বায্'যার ২১- সামউয়াহ ২২- তাবরানী ২৩- আবু ইয়ালাহ ২৪-বাগাবী ২৫ -হাকীম সাইয়্যিদুনা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(৭)২৬- ইমাম আহমদ ২৭ -বাগাভী ২৮- তাবরানী ২৯- আবূ নুয়াইম ৩০- বাওরারদী ৩১- ইবনুল কানে ৩২- যিয়া হযরত তামাম বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(৮) ৩৩- ইমাম আহমদ ৩৪-বাওয়ারদী তামাম ইবনে কাশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(৯) ৩৫- উসমান বিন সাঈদ দারমী আর রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ এর মধ্যে ৩৬-দারু কুতনী আহাদীসুন নুযুল এর মধ্যে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ওয়াজহাহুল করীম হতে বর্ণনা করেছেন।

(১০) ৩৭-তাবরানী জামে কবীর এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(১১) ৩৮- তাবরানী জামে আওসাত এর মধ্যে ৩৯- খাতীব তাবরেযী হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(১২) ৪০- আবূ নুয়াইম রিসালায়ে সিওয়াক এর মধ্যে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(১৩) ৪১- সাঈদ বিন মানসুর হযরত মাকহোল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

(১৪) ৪২- আবূ বকর বিন আবু শায়বা হাসসান বিন আতিয়া হতে বর্ণনা করেছেন। (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ডঃ ১, পৃঃ ১৪৯-১৫২, রেযা একাডেমি মুম্বাই)

প্রকাশ থাকে যে, এটি কেবল একটি উদাহরণ নয় বরং আরও শত শত এই ধরণের উদাহরণ আছে যে, তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করার পরে একাধিক সূত্রে সেই হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং যত বর্ণনাকারী আছে সকলের নাম উল্লেখ করেছেন তাও আবার একাধিক কিতাবের রেফারেন্স দিয়ে। এ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসের সূত্র সম্পর্কে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জ্ঞান কোন পর্যায়ের ছিল!

সনদ বা সূত্র প্রসঙ্গে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনটি কিতাব রচনা করেছেন।

(১) আল ইজাযাতুর রাযাবিয়াহ (আরবী)

(২) আল ইজাযাতুল মাতানিয়্যাহ লি ওলামায়ে বি মাক্কাতা ওয়াল মাদীনাহ (আরবী)

(৩) আন নুরুল বাহাউ ফি আসানীদিল হাদীস ওয়া সালাসিলি আওলিয়াইল্লাহ (আরবী)

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী,
উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্যঃ
এম. জি.এফ. মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর,
কালিয়াচক, মালদা

আমরা হুসাইনের গোলাম বলা কি শির্ক?

মুফতি গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী, (পাকুড় ঝাড়খণ্ড)

বর্তমান সময়ে কিছু ব্যক্তি নিজে নিজে কুরআন ও হাদীস অধ্যায়ন করে নিজেকে মস্ত বড় জ্ঞানী মনে করে এবং বিভিন্ন রকমের ফতুয়াবাজি করতে তারা পিছু পা হয়না। তারই মধ্যে একটি হলো যে, তারা বলে যে নিজেকে ইমাম হুসাইনের গোলাম বলা শির্ক তো আমি অধম তাদের মূর্খামির দলীলভিত্তিক জবাব দেওয়ার আপ্রায়ন প্রয়াস করবো।

তাদের মূর্খামির উত্তরঃ

এই মূর্খরা নিজেদের কে আহলে হাদীস দাবি করে অথচ আল্লাহর ক্ষেত্রে "গোলাম" শব্দ ব্যবহার করে, তারা কি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে কোথাও "আল্লাহর গোলাম" শব্দ দেখাতে পারবে কিয়ামত পর্যন্ত পারবেনা, কেননা কুরআন বা হাদীসে আল্লাহর ক্ষেত্রে কোথাও "আল্লাহর গোলাম" শব্দ ব্যবহৃত হয়নি বরং হাদীস বা কুরআনে "আল্লাহর বান্দা" ("আব্দ" আব্দুল্লাহ, ইবাদিহি, ইত্যাদি) শব্দের অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তাই আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা মুসলমানদেরকে আল্লাহর বান্দা বলে সম্বোধন করে থাকি। বড্ড আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তারা নিজেকে আহলে হাদীস দাবি করছে, আবার হাদীসে আল্লাহর ক্ষেত্রে যে শব্দ নেই সেই শব্দ ব্যবহার করছে। নিজেকে "আহলে হাদীস" বলতে একটু লজ্জা করা দরকার।

"গোলাম" এটা আরবি শব্দ, যার কয়েকটি অর্থ রয়েছেঃ খাদেম, বাচ্চা, নব যুবক, সন্তান ইত্যাদি। (আরবির বিখ্যাত অভিধান, মুজামুল ওয়াসিত) এবং কুরআনের মধ্যে কয়েক জায়গায় বাচ্চা বা সন্তান এর অর্থে "গোলাম" শব্দ এসেছে

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ.

অনুবাদঃ-অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলো, শেষ পর্যন্ত যখন একটা বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তখন ঐ বান্দা তাকে হত্যা করে ফেললো।

(সূরা কাহাফ, আয়াত নং ৭৪)

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ.

অনুবাদঃ-হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি এক পুত্রের, যার নাম ইয়াহ্ইয়া।

(সূরা মারিয়াম, আয়াত নং ৭)

উক্ত আয়াতগুলো ছাড়াও বহু আয়াতে "গোলাম" বাচ্চা বা সন্তান এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং (غلام الله) "আল্লাহর গোলাম" এর অর্থ আল্লাহর বাচ্চা বা সন্তান কিংবা খাদেম হবে। এবার বলেন যে শব্দের অর্থ বাচ্চা বা সন্তান কিংবা খাদেম সেই শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবে।

একটি আপত্তি ও তার উত্তর :

কিন্তু এই জায়গায় তারা একটি প্রশ্ন করতে পারে যে (عبد) "আব্দ"(বান্দা) এর আরো একটা অর্থ "খাদেম" তাহলে "আব্দ" শব্দ কি করে আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উত্তরঃ-"আব্দ" শব্দের একটা অর্থ খাদেম হলেও তার একটা মুল অর্থ বান্দা, উপাসক । এছাড়াও "আব্দ" শব্দ কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর ক্ষেত্রে বান্দা'র অর্থে এসেছে, অতএব "আব্দ" শব্দ ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু গোলাম শব্দের অর্থ বাচ্চা বা সন্তান কিংবা খাদেম এবং সেই শব্দ কুরআন বা হাদীসে নেই সেই কারণে ব্যবহার করা চলবেনা।

যদি তারা দাবি করে যে "আল্লাহর গোলাম" বলা চলবে তাহলে কুরআন, হাদীস কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের উক্তি দেখিয়ে

দেক যে "আল্লাহর গোলাম" বলা যাবে। অসম্ভব কোন দিনই পারবেনা। কিন্তু আমি দেখাচ্ছি " আল্লাহর গোলাম" বলা যাবেনা।

চার শত বছর পূর্বের একজন নির্ভরযোগ্য আলিম, আরিফ বিল্লাহ, আল্লামা আব্দুল গনি নাবুলসি নিজের পুস্তক "আল হাদীক্বাতুন নাদিয়া" এর মধ্যে লিখেন:

يقال عبدالله وامة الله ولا يقال غلام الله وجارية الله

অনুবাদঃ-আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর বান্দী বলা যাবে কিন্তু আল্লাহর গোলাম এবং আল্লাহর দাসী বলা যাবেনা।

এ দ্বারা প্রমাণ হলো যে গোলামের সংযোগ আল্লাহর দিকে করা যাবেনা অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম বলা যাবেনা। কিন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর দিকে গোলামের সংযোগ করা যাবে কি না? যেমন- নবীর গোলাম, হুসাইনের গোলাম, ইত্যাদি। মূর্খ, নামধারী আহলে হাদীসরা তথা লা মাযহাবীরা বলছে: আল্লাহ ব্যাতিত কারোর গোলাম যেমন- নবীর গোলাম, হুসাইনের গোলাম ইত্যাদি বলা শির্ক ।

উত্তরঃ-প্রথমতঃ তারা শির্কের অর্থই জানেনা। সর্বপ্রথম শির্ক শব্দের উপর আলোকপাত করি।

একজন বিখ্যাত আলিম আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানি, নিজের পুস্তক "শারহে আক্বাইদ" এর মধ্যে বলেন:

الاشتراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى واجب الوجود أو بمعنى استحقاق العبادة.

অনুবাদঃ-ইবাদত বা উপাসনার উপযুক্ত এবং অস্তিত্বের ওয়াজিব হওয়াতে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক কিংবা অন্তর্ভুক্ত করা, অর্থাৎ একমাত্র ইবাদত বা উপাসনার উপযুক্ত আল্লাহ তা'আলা এবং কেবল আল্লাহর অস্তিত্ব ওয়াজিব অর্থাৎ কেবল আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, তিনি সব সময় ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, তাঁর জন্য ধংস অসম্ভব, এই গুণে কাউকে গুণান্বিতকরাই হলো শিরক।

এবার বলেন যে শব্দ আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করাই জায়েয নয় সে শব্দ আল্লাহ ব্যাতিত কারোর জন্য ব্যবহার করলে কি করে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা হলো ? এটা কি একটা হাস্যকর বিষয় নয় ? এর পুর্বে প্রমাণ হলো যে গোলাম মানে খাদেম, বাচ্চা বা সন্তান। এবং এই আক্বীদা টি চূড়ান্ত যে আল্লাহ বাচ্চা, সন্তান বা খাদেম থেকে পবিত্র। তাহলে কাউকে কারোর খাদেম, বাচ্চা বা সন্তান ইত্যাদি বললে আল্লাহর সঙ্গে শরিক কি করে করা হলো?

যদি নবীর গোলাম, হুসাইনের গোলাম বলা শির্ক হয়ে থাকে তাহলে তারা ক্বুরআন বা হাদীসে দেখিয়ে দিক, যে আল্লাহ বা আল্লাহর রসূল বলেছেন: যে নবীর গোলাম বা হুসাইন এর গোলাম বলা শির্ক । কিয়ামত পর্যন্ত তারা দেখাতে পারবেনা। কিন্তু আমি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামগণদের মত এবং সেই নামধারী আহলে হাদীস দের পুস্তক থেকে প্রমাণ করে দেখাবো যে নবীর গোলাম, হুসাইন এর গোলাম বলা জায়েয রয়েছে।

প্রথম দলীল :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ :عَبْدِي وَأَمَتِي، كُلُّكُمْ عُبِيدُ اللَّهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ :غُلَامِي وَجَارِيَتِي، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي".

অনুবাদঃ-হযরতে আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কেউ কখনই আমার বান্দা বা আমার বান্দি বলবেনা, তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সমস্ত মহিলা আল্লাহর বান্দি। কিন্তু তোমরা বলবে, আমার গোলাম আমার দাসী, আমার যুবক আমার যুবতী।

(মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২২৪৯, বুখারি শরিফ হাদীস নং ২৫৫২)

এই হাদীসের মধ্যে আমার দয়ার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত উম্মত দেরকে বলছেন: তোমরা নিজের চাকরদের কে আমার "আব্দ" (বান্দা) বলে সম্বোধন করবে

না, কেননা তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা কিন্তু তোমরা তাদের কে নিজের গোলাম বলতে পারো। কিন্তু এই যুগের মূর্খ নামধারী আহলে হাদীসরা বলছে আল্লাহ ছাড়া কাউরির গোলাম বলা চলবেনা সেটি শির্ক । তাহলে সেই মূর্খদের কে বলেন: আমার রসূলের উপর শিরকের ফতোয়া লাগাও, যদি মায়ের লাল হয়ে থাকো তো বলো, নবী মুশরিক। (নাউযুবিল্লাহ)

এই হাদীসে আমার নবী ﷺ সাধারণ মানুষদের জন্য নিজের চাকরদের কে গোলাম বলার অনুমতি দিলেন। তাহলে আমরা নিজে কে সারা বিশ্বের নবী এবং তাঁর সবথেকে প্রিয় নাতির গোলাম কেন বলতে পাবো না ?

দ্বিতীয় দলীল:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ :لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ» :أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْكُمْ أَنَّكُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ.

অনুবাদ:-হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়য়িব থেকে বর্নিত তিনি বলেন: যখন হযরতে উমরে ফারুক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেম্বারে উঠে লোকজনের নিকট খুতবা দিলেন, সুতরাং তিনি আল্লাহর প্রসংশা এবং তিনার সানা বয়ান করলেন অতঃপর বললেন: হে মানব কুল! নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে জানি যে তোমরা আমার তীব্রতা ও কঠোরতা থেকে অবগত, এবং তা এই যে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম সুতরাং আমি তিনার গোলাম বা আনুগত্য কারি এবং খাদেম ছিলাম।

ইমামে হাকিম এই হাদীসটিকে উল্লেখ করার পর বলেন: এই হাদীসটির সূত্র সহীহ। (মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন হাদীস নং ৪৩৪, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৫, কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৪২৮৪, পঞ্চম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৬৮১)

এই হাদীসে তৃতীয় খলিফা হযরত উমারে ফারুক্ব রদিয়াল্লহু তা'আলা আনহু সাহাবায়ে কেরামদের সামনে নিজে কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আব্দ (গোলাম) ও খাদেম বললেন কিন্তু কোন সাহাবি আপত্তি করলেন না। বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম দের নিকটে নিজেকে নবীর গোলাম বা খাদেম বলা জায়েয রয়েছে, শির্ক তো দুরের কথা বরং তিনারা গর্ববোধ করতেন। তাহলে বুঝা গেল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মত ও পথ সাহাবায়ে কেরাম দের বিরুদ্ধে নয়। বরং আমাদের মত সেটাই যেটা সাহাবাদের মত।

মুর্খ নামধারী আহলে হাদীসরা আপন মায়ের দুধ পান করে থাকলে হযরত উমারে ফারুক্ব এবং সাহাবাদের উপর শিরক এর ফতোয়া লাগানোর সাহসিকতা করুক, তিনাদের কে মুশরিক ঘোষণা করুক, দেখি।

যদি হযরত উমারে ফারুক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং সাহাবায়ে কেরামগণ নিজেকে নবীর গোলাম বা খাদেম বলতে পারেন এবং তিনাদের এই কর্ম শির্ক না হয়, তাহলে আমরা তিনাদের অনুসারী হয়ে নিজেকে নবীর বা হুসাইনের গোলাম কেন বলতে পাবো না ? এবং বললে কেন শির্ক হবে ?

তৃতীয় দলীল :

এবার তাদের বাড়ির একটু খবর নিন। তাদের ওলামারা এ ব্যাপারে কি লিখেছে ?

তাদের একটা বড়ো আলেম হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী, লিখেছে :

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واصل بحق ہیں، عباد اللہ کو عباد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ، مرجع ضمیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا : کہ قرینہ بھی انہیں معنی کا ہے۔ آگے فرماتا ہے :لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ اگر جع اس کا اللہ ہوتا فرماتا من رحمتی تا کہ مناسب عبادی کی ہوتی۔

অনুবাদ:-যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে, আল্লাহর

বান্দাদের কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বান্দা (গোলাম) বলা যেতে পারে, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: হে নবী! আপনি বলুন: হে আমার ঐ বান্দাগণ যারা নিজের আত্মার উপর অত্যাচার করেছো। এইখানে ইয়া (ى) সর্বনাম নবীর দিকে উল্লেখ, অর্থাৎ এইখানে হুজুর বলেছেন: "হে আমার বান্দারা"। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব আগে বলেছে: "আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়োনা" তে যদি সর্বনাম আল্লাহর দিকে উল্লেখ হতো তাহলে "মির রহমাতিললাহ" বলতেন না বরং "মির রহমাতি" বলতেন, যাতে "মিন ঈবাদির" সঙ্গে একরূপতা হয় ।

(ইমদাদুল মুশতাক্ব ইলা আশরাফিল আখলাক্ব, পৃষ্ঠা নং ৯২)

এই বইয়ের মধ্যে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী এবং আশরাফ আলী থানবী দু'জনেই বলেছে: উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে আল্লাহর বান্দাদের কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বান্দা (গোলাম) বলা যাবে।

মুর্খ নামধারী আহলে হাদীস যদি মায়ের দুধ পান করে থাকে তাহলে এই দুজনের উপর শির্ক এর ফতোয়া অর্পণ করুক, তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা করুক।

চতুর্থ দলীল :

আমরা নিজেদের সন্তান দের নাম: গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম মুহাম্মদ, গোলাম হুসাইন ইত্যাদি রেখে থাকি, তাহলে কি যারা এইসব নাম রেখেছে এবং যাদের নাম রেখেছে সকলেই শির্ক করেছে ? এবং তারা মুশরিক ? যদি তাই হয় তাহলে মুর্খ নামধারী আহলে হাদীস দের আলেম, হাফেজ আবদুল মান্নান নুরপুরির উপর কি ফতোয়া পড়বে ? যে তাদের একজন বড়ো মাপের আলেম, অনলাইনে গুগল ওয়েবসাইটে ফতোয়া দেয়, সে তার পুস্তক "ক্বুরআন ও হাদীস কি রোশনী মেঁ আহকাম ও মাসায়েল" এর মধ্যে লিখেছে :

غلام رسول، غلام نبی، غلام حسین، غلام فرید جیسے نام درست ہے بشرطیکہ غلام بمعنی خادم ہو۔

অনুবাদ:-গোলাম রসূল, গোলাম নবী, গোলাম হুসাইন, গোলাম ফারীদ এইরকম নাম রাখা সঠিক, হ্যাঁ, তবে শর্ত এই যে, গোলামের অর্থ খাদেম হতে হবে ।

(ক্বুরআন ও হাদীস কি রোশনী মেঁ আহকাম ও মাসায়েল, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৪৬)

মুর্খ অন্ধ নামধারী আহলে হাদীস দের কে বলবো: যদি বাপের বৈধ সন্তান হয়ে থাকো, তাহলে এই পুস্তকের লেখক আব্দুল মান্নান নুরপুরির উপর শির্কের ফতোয়া অর্পণ করো এবং তাকে মুশরিক ঘোষণা করো।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ ! আশা রাখি আপনারা খুব ভালো করে বুঝে গেছেন মূর্খ নামধারী আহলে হাদীসরা কতো বড়ো ধোকাবাজ, সাধারণ মানুষ কে বিভ্রান্তের বেড়াজালে নিক্ষেপ করে তাদের ঈমান কে লুণ্ঠন করার জন্য কি ভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, তারা মানুষের মধ্যে কি ভাবে ফিতনা ছড়াচ্ছে, সাধারণ মানুষ কে কিভাবে ভুল তথ্য শুনিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছে। আমি সকল মুসলমান কে বলবো একমাত্র সঠিক ও নাজাত প্রাপ্ত দল "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত" এই দল কে মজবুত ভাবে ধরে রাখেন সৎ পথে থাকবেন, আপনার দুনিয়া ও আখিরাত মঙ্গলময় হবে, ইনশাআল্লাহ্ ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যাতিত সমস্ত দল পথভ্রষ্ট। এবং আল্লাহ তা'আলা বেশি ভালো জানেন।

ইতি:

মুফতি গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী

(পাকুড় ঝাড়খণ্ড)

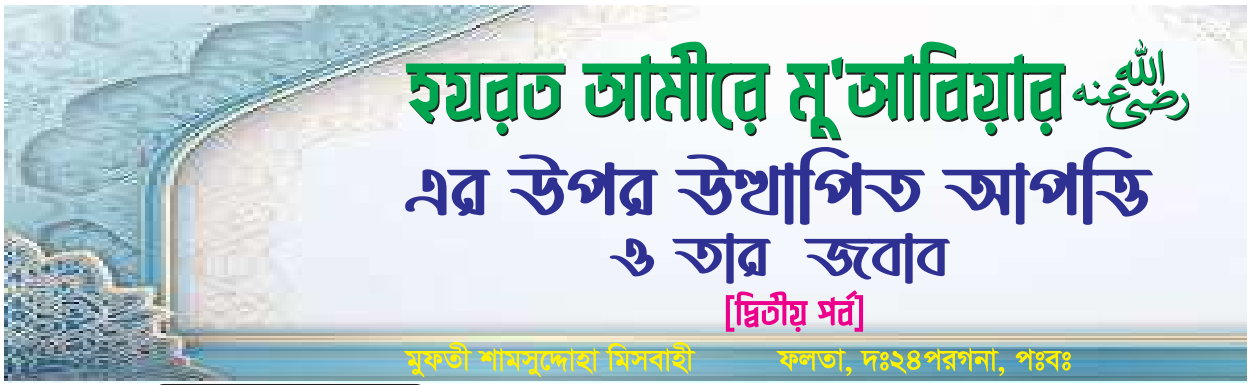

হযরত আমীরে মু'আবিয়ার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর উপর উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব

[দ্বিতীয় পর্ব]

মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী ফলতা, দঃ২৪পরগনা, পঃবঃ

তৃতীয় আপত্তিঃ-

হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মওলা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিতেন। (মা'যাল্লাহ)

শিয়া ও রাফেজিদের পক্ষ থেকে বারংবার আপত্তি শোনা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে গালি দিতেন এবং অপরকে গালি দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। তারা কয়েকটি দুর্বল হাদিস ও তার অপব্যাখ্যা করে নিজেদের আপত্তিকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালায় এবং হাদিসের নামে অপপ্রচার করে সহজ সরল মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের দলিল স্বরূপ দেওয়া সমস্ত হাদিস ও তার সঠিক জবাব সম্পর্কে একের পর এক নিম্নে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম হাদিসঃ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، -وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ- عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَنْ أَسُبَّهُ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِي". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ". قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ "ادْعُوا لِي عَلِيًّا". فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

অনুবাদঃ-সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: মু'আবিয়াহ্ ইবনু আবি সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে 'আমির (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করলেন এবং বললেন, আপনি 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কেন মন্দ বলেন না(মন্দ বলতে কোন জিনিস বাধা দেয়)? সা'দ বললেন, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্বন্ধে যে তিনটি কথা বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তা আমি মনে রাখবো ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও তাঁকে খারাপ বলব না। সেসব কথার মধ্য হতে একটিও যদি আমি লাভ করতে পারতাম তাহলে তা আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক কল্যাণকর হত। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি- আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের মধ্যে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, হে আল্লাহর রসূল? তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি এতে আনন্দবোধ করো না যে, আমার নিকট তোমার সম্মান মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট হারূন (আলাইহিস সালাম)-এর মতো। এ কথা ভিন্ন যে, আমার পর আর কোন নবী নেই। খাইবারের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক লোককে পতাকা (ইসলামের ঝাণ্ডা) দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর

রসূলও তাঁকে ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা (অধির আগ্রহে) অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তাঁর চোখ(অসুখ হয়েছিল) উঠেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চোখে থুথু মুবারক লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা সঁপে দিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয়মালা (পতাকা) তুলে দিলেন। আর যখন আয়াত: 'চলো আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি'- (সূরাহ্ আলে 'ইমরান ৩: ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাঈন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ডাকলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার-পরিজন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং মতান্তরে ৬০০২, ৬০৪১,৬১১৪,, সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল মানাকীব, হাদীস নং ৩৩৫৮,, সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল খাসায়েস, হাদীস নং ৭১৬৯,, হাকিম আল মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪৫৫২)

তাদের আপত্তি

১) হযরত আমীরে মু'আবিয়া হযরত আলী কে গালি দিতেন ও অপরকে গালি দেওয়ার আদেশ ও করতেন।

আমাদের জবাবঃ

প্রথমত আমাদের تسب (তাসুব্বু) শব্দের সঠিক অর্থ জানা একান্ত জরুরী যার দ্বারা প্রায় ৮০- ৯০ শতাংশ আপত্তির জবাব ও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে । আরবি ভাষায় এক একটি শব্দের অর্থ তার ব্যবহৃত স্থান অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে যেমন উক্ত হাদিসে উল্লেখিত تسب (তাসুব্বু) শব্দটির একটি অর্থ যেমনভাবে গালি দেওয়া হয় তেমনি উক্ত শব্দের অন্যান্য অনেক অর্থ রয়েছে যেমন নিন্দা করা, দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা ও কখনো কখনো আরববাসীরা অন্যের মতামত কে ভুল ও নিজের মতকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য উক্ত শব্দটি ব্যবহার করে থাকে সুতরাং উক্ত হাদিসে উল্লেখিত শব্দটির ما منعك ان "تسب اباتراب "সঠিক অর্থ হবে যে আবু তুরাবকে নিন্দা করতে কোন জিনিসটি বাধা দেয়? এখানে تسب (তাসুব্বু) শব্দের অর্থ গালি দেয়া হবে না বরং নিন্দা করা ও অপরের মতের বিপক্ষে মত পোষণ করা হবে। যেমন অন্যান্য হাদিসে উক্ত শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার হয়েছে ।

যেমন বুখারী শরীফে একটি দীর্ঘ হাদীস যাতে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার মধ্যে বাগে ফাদাক সম্পর্কে মতভেদের ঘটনা ও হযরত উমারের নিকটে তার সমাধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই হাদীসে سب (সাব্ব) শব্দটি এসেছে

قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِيْ أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ

অনুবাদ:-আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে, আমীরুল মু'মিনীন! আমার এবং তাঁর মাঝে (বিবাদের) মীমাংসা করে দিন। বনূ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা দিয়েছিলেন তা নিয়ে তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে তারা তর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৩৩)

উক্ত হাদিসে سب (সাব্ব) শব্দের অর্থ "তর্কে লিপ্ত হওয়া অর্থাৎ অপরের বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করা" করা হয়েছে ।কোন রাফেজি শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত হাদিসের সাব্ব শব্দের অর্থ গালি দেওয়া করে এই হুকুম লাগাতে পারবে যে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস একে অপরকে গালি দিয়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) না কোনদিনই পারবেনা কারণ সাব্ব শব্দ উক্ত হাদীসে অপরের বিপক্ষে মত পোষণ করা অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। এই হাদীস দ্বারা বোঝা বোঝা গেল সাব্ব শব্দের অর্থ শুধুমাত্র গালি দেওয়া নয় বরং ব্যবহৃত স্থান অনুযায়ী তার অর্থ ভিন্ন হতে পারে।

বুখারী শরীফের অপর একটি হাদীসেও

সাব্ব শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অনুবাদঃ-আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি নবী কে এ দু'আ করতে শুনেছেন: হে আল্লাহ্! যদি আমি কোন মু'মিন লোককে খারাপ বলে থাকি, তবে আপনি সেটাকে ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আপনার নৈকট্য অর্জনের উপায় বানিয়ে দিন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬১)

প্রিয় পাঠক বন্ধু! উক্ত হাদিসেও সাব্ব শব্দটি নিন্দা ও দোষ ত্রুটি বর্ণনা করার অর্থেই এসেছে ।সাব্ব শব্দের কেবলমাত্র একটি অর্থ জেনে উক্ত হাদিসে রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে গালি দেওয়ার অর্থ করা কোন মুমিনের পক্ষের সম্ভব নয় তাহলে মানতে হবে যে سب (সাব্ব) শব্দের অর্থ সব জায়গায় গালি দেওয়া হয় না বরং তার ব্যবহৃত স্থান দেখে ভিন্ন অর্থও হতে পারে যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া একাধিক হাদিসে উক্ত শব্দ গালি দেওয়া ছাড়া ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যা লেখনী সংক্ষিপ্ত রূপে সমাপ্তির উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হলো না ।

মূল হাদীসের ব্যাখ্যা

অতএব تسب (তাসুব্বূ) শব্দের উক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্মুখে রেখে উক্ত হাদিসে উল্লেখিত বাক্যের "تسب ابا تراب ما منعك ان" সঠিক অর্থ হবে যে আবু তুরাবকে নিন্দা করতে কোন জিনিস বাধা দেয়? এখানে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দকে গালি দেওয়ার আদেশ করেননি বরং উনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিন্দা করতে তোমাকে কোন জিনিসটি বাধা দেয় যা সুস্পষ্ট হাদিসের শব্দ দ্বারা পরিলক্ষিত।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদিস সম্পর্কে বহু উলামায়ে কেরাম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইমাম নববী,ইমাম কুরতুবী, ইমাম আলুসীও অন্যান্য অনেকেই ।

যেমন মুসলিম শরীফের জগৎবিখ্যাত ব্যাখ্যা কারক হযরত আল্লামা এহয়াহ বিন শারফ নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন:

فَقَوْلُ مُعَاوِيَةَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا بِسَبِّهِ وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنِ السَّبَبِ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ السَّبِّ كَأَنَّهُ يَقُولُ هَلِ امْتَنَعْتَ تَوَرُّعًا أَوْ خَوْفًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ تَوَرُّعًا وَإِجْلَالًا لَهُ عَنِ السَّبِّ فَأَنْتَ مُصِيبٌ مُحْسِنٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَهُ جَوَابٌ آخَرُ

অনুবাদঃ-এখানে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেওয়ার আদেশের কথা স্পষ্ট উল্লেখ নাই বরং তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিন্দা না করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। যেন তিনি (হযরত সা'দ কে) বলতে চাইছিলেন যে নিন্দা থেকে বিরত থাকার কারণ কী ভয়, সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য না অন্য কিছু যদি তাঁর (হযরত আলীর) সম্মান ও তাঁর সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য (নিন্দা থেকে বিরত থাকা) হয় তাহলে তুমি সঠিক ও ভালো ব্যক্তি এবং যদি অন্য কোন কারণ হয় তাহলে তার অন্য কোন জবাব রয়েছে ।

(শারহে মুসলিম লিন নববী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭৮)

আরো একটি ব্যাখ্যা হযরত ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখ করেছেনঃ

أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخَطِّئَهُ فِي رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا

অনুবাদঃ-তোমাকে তার সিদ্ধান্ত এবং ইজতিহাদের ভুল এবং আমার সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদের সঠিকতা তুলে ধরতে তোমাকে কোন জিনিসে বাধা দিচ্ছে?

(শরহে নববী আলা মুসলিম-২/২৭৮)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! সকলেই এই বিষয়ে অবগত যে হযরত আমিরের মুয়াবিয়া ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমার লোকেদের মাঝে দৃষ্টিভঙ্গিগত ইজতেহাদী মতভেদ ছিল। দুই দলই নিজেদের অবস্থানকে সঠিক এবং অপরের অবস্থানকে ভুল মনে করতেন। তাই এখানে সাব্ব

শব্দ দ্বারা অপর দলকে ভুল সাব্যস্তকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। গালাগালি দেওয়া হয়নি এবং হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো একজন সম্মানিত সাহাবী কাতিবে রসূল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মত ফজিলত পূর্ণ সাহাবী ও প্রিয় নবীর খলিফাকে কেমন ভাবে গালি দিতেন এটি অসম্ভব একটি বিষয় ।

উক্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার আলোকে দিবালোকের ন্যায় প্রতিয়মান হয় যে হযরত আমিরের মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হযরত আলী সম্পর্কে গালি দেওয়ার আদেশ দেননি বরং তাঁকে (হযরত সা'দ কে) তাঁর (হযরত আলী) সম্পর্কে নিন্দা থেকে বিরত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন সুতরাং উক্ত হাদীস দ্বারা শিয়া ও রাফিজিদের আপত্তি ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য।

সনদগত গবেষণা

উক্ত আলোচনা হাদীসের মতনগত দিক থেকে ছিল যদি তার সনদগত দিক থেকে গবেষণা করা যায় তাহলে ফলাফল বের হবে যে উক্ত হাদিসটি খবরে ওয়াহিদ (যা এক প্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখে) ও গরিব হাদিসের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং এরূপ একপ্রকার সন্দেহযুক্ত হাদিস দ্বারা কারো প্রতি দলিল উপস্থাপন করা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনে স্বালেহ লেখেন:

الحديث الذى يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب" وكذلك الحديث الذى يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه. غيره إما فى متنه وإما فى إسناده

অনুবাদ:-গরিব সেই হাদীসকে বলা হয়, কতক রাবি একক যা বর্ণনা করে অনুরূপ কোন রাবি যদি হাদীসের কোন অংশ একক ভাবে বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে সনদ হোক আর মতনের অংশ হোক উভয়ই গরিব।

(উলুমে হাদীস, পৃষ্ঠা - ৪৭০)

উক্ত বর্ণনায় বর্ণনাকারী হচ্ছেন একমাত্র সা'দ বিন আবি ওয়াক্বাস, তার থেকে একমাত্র বর্ণনাকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন আমির বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্বাস। তিনি ব্যতীত হজরতে সা'দ বিন আবি ওয়াক্বাসের কাছ থেকে কোন সাহাবী বা তাবেয়ি এই বর্ণনা শুনেছেন বলে তার প্রমাণ নেই। তাছাড়া আমির বিন সা'দের কাছ থেকে একমাত্র শ্রোতা হলেন বুকাইর বিন মিস্মার, তিনি ছাড়া অন্য কোন রাবি পাওয়া যায়নি। সুতরাং হাদীসটি খবরে ওয়াহিদ সাথে সাথে সনদের দিক থেকে অতিমাত্রায় গরীব প্রকৃতির।

সনদে উল্লেখিত বুকাইর বিন মিস্মার সম্বন্ধে ইমামগণ সমালোচনাও করেছে যা নিম্নে দেয়া হলঃ

بكير بن مسمار (1) أخبرنا ابن حماد قال :قال البخارى بكير بن مسمار أخو مهاجر بن مسمار روى عنه أبو بكر الحنفى فى حديثه بعض النظر

অনুবাদ:-খবর দিলেন ইবনে হাম্মাদ তিনি বলেন ইমাম বুখারী বলেছেন বুকাইর বিন মিসমার হলো মুহাজির বিন মিসমারের ভাই, আবু বকর হানাফি তার থেকে বর্ণনা করে থাকেন তার হাদীসে সমালোচনা আছে।

(তাহজিবুল কামাল, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৪২)

إسناده ضعيف؛ لضعف بكير بن مسمار

অনুবাদ:-ইহার সনদ জইফ, বুকাই বিন মিসমার জইফ হওয়ার কারণে।

(তারিখুল বাগদাদ, খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৩০৩)

প্রিয় পাঠক বন্ধু! আপনারা লক্ষ্য করলেন উক্ত হাদিসটির মতন ও সনদ দুই দিক থেকেই শিয়া ও রাফেজিদের উত্থাপিত আপত্তি প্রমাণ হয় না সুতরাং তাদের আপত্তি ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য ।

দ্বিতীয় হাদীস

এই একই প্রসঙ্গে যে হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু কে গালি দিয়েছেন তারা নিম্নে দেওয়া হাদিস দলিল উপস্থাপন করে থাকে।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، -وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ

فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ" . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى" . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ "لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" .

অনুবাদ: সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত:তিনি বলেন, মুআবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) একবার হাজ্জ করতে আসেন। সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার নিকটে উপস্থিত হলে লোকেরা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে (অশোভন) উক্তি করে। এতে সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কটুক্তি করলে যার সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু। আমি, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরো বলতে শুনেছিঃ তুমি আমার কছে ঐরূপ যেরূপ ছিলেন হারূন (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট। তবে আমার পরে কোন নবী নেই। আমি,নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরো বলতে শুনেছিঃ আজ (খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পন করবো, যে আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং -১২১,, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বাহ, হাদীস নং -৩১৩৫৯)

তাদের আপত্তি

১) হযরত আমির মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়েছেন

আমাদের জবাবঃ

প্রথমত হাদিসের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে হযরত আমির মোয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলীর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে গালি তো দূরের কথা কোন অশোভন উক্তি না নিজে করেছেন আর না কাউকে করার আদেশ দিয়েছেন। উক্ত হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হজে এসেছিলেন এবং হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন সেখানে উপস্থিত লোকেরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অশোভন উক্তি করেন কিন্তু শিয়ারা চালাকি ও মিথ্যাচার করে সেটিকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নামে চালিয়ে তাঁর উপর আপত্তি উত্থাপন করে। হজে আগত মানুষজন যদি কারো উপর অশোভন করে, তাহলে কি তার দায় হযরত আমিরে মুয়াবিয়ার উপরে হবে? একদমই না সুতরাং বোঝা গেল যে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী সম্পর্কে গালি ও অশোভন উক্তি করেননি ।

তাছাড়া উক্ত হাদিসটি সনদগত দিক থেকে যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য তার কারণ নিম্নে দেওয়া হলো:

قيل ليحيى بن معين سمع عبد الرحمن من سعد بن أبي وقاص ؟ قال: لا. قيل :من أبي أمامة؟ قال :لا. قيل :من جابر؟ قال :لا هو مرسل

অনুবাদঃ-ইহাইয়া ইবনে মঈনকে জিজ্ঞাসা করা হলে, বলেন আব্দুর রাহমান হজরতে সা'দের কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, না। জিজ্ঞাসা করা হলো আবু উমামা থেকে? তিনি উত্তর দিলেন, না। জিজ্ঞাসা করা হলো হজরতে জাবির থেকে? তিনি উত্তর দিলেন, না।

(তাহজিবুত ত্যাহজিব খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৮০)

সনদ পর্যালোচনা করার পর জানা যায় উক্ত হাদীসে আব্দুর রাহমান ইবনে সাবিত কোন হাদীসই সরাসরি হজরতে সা'দ থেকে শোনেননি অতএব বলা যেতে পারে হজরতে সা'দ যে বর্ণনা করেছেন তা প্রমাণিত নয়। যেহেতু বর্ণনাটির যথাযথ সাক্ষী নেই সেক্ষেত্রে যথাযথ সাক্ষী না থাকায় ইহা গ্রহনযোগ্য হবে না এবং এই প্রমাণের দ্বারা কাওকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না । এখানেও তাদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যাত।

তৃতীয় হাদীস

وقال أبو زرعة الدمشقي :ثنا أحمد بن خالد الذهبي أبو سعيد ثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه قال :"لما حج

معاوية وأخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك. قال :فما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره ثم ذكر علي بن أبي طالب فوقع فيه فقال :أدخلتني دارك وأجلستني على سريرك ثم وقعت في علي تشتمه ؟

অনুবাদঃ-আব্দুল্লাহ ইবনে নাজিহ তাঁর পিতা হইতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন যখন হজরতে আমীরে মুয়াবিয়া হজে গেলেন হজরতে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস হাত ধরলেন এবং বললেন হে আবু ইসহাক যুদ্ধ আমাদেরকে হজ থেকে আঁটকে রেখেছিলো সম্ভবনা ছিলো আমরা তার নিয়মগুলি ভুলে যেতাম। এখন আপনি তাওয়াফ করতে থাকুন আপনাকে তাওয়াফ করতে দেখে আমরাও তাওয়াফ করবো। যখন হজ থেকে বেরিয়ে এলেন তখন দারুন নাদওয়াতে নিয়ে গেলেন আর হযরত আমীরে মুয়াবিয়া তার ঘরের খাটে নিজের সাথে হজরতে সা'দকে বসালেন। অতঃপর হজরতে আলীর কথা উঠলে তাঁর সম্বন্ধে উল্টোপালটা বলতে শুরু করে দেন হজরতে সা'দ বললেন আপনি নিজের ঘরে খাঠের উপর নিজের সাথে বসিয়ে মওলা আলীকে গালি বলতে শুরু করে দিলেন?

(ইবনে কাসীরঃ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-৩৭৬)

তাদের আপত্তি

১) হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কে গালি দিয়েছেন

আমাদের জবাবঃ

উক্ত বর্ণনাটি আমীরে মুয়াবিয়ার প্রতি শিয়ারা তাদের অভিযোগ প্রমাণার্থে যে দলিলগুলি দেয়, তার মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এই বর্ণনার উপর আমার জবাব হলো উক্ত হাদীস ও এর পুর্বের হাদীস লক্ষ করলে, দেখা যায়, এর পুর্বের বর্ণনায় ছিলো আমীরে মুয়াবিয়া হজে এলে, হজরতে সা'দ নিজে আমীরে মুয়াবিয়ার নিকট সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন কিন্তু উক্ত বর্ণনায় আছে আমীরে মুয়াবিয়া হজরতে সা'দের হাত ধরে বলছেন হে আবু ইসহাক যুদ্ধ আমাদেরকে হজ থেকে আঁটকে রেখেছিলো সম্ভবনা ছিলো আমরা তার নিয়মগুলি ভুলে যেতাম। এখন আপনি তাওয়াফ করতে থাকুন আপনাকে তাওয়াফ করতে দেখে আমরাও তাওয়াফ করবো। এবং পরে হজ শেষ হলে তিনি হজরতে সা'দকে নিজের সাথে নিয়ে যান অথচ পুর্বের বর্ণনায় ছিলো হজরতে সা'দই দেখা করতে গিয়েছিলেন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া তাকে নিয়ে যাননি। কিন্তু উক্ত বর্ণনায় সা'দ নিজে সাক্ষাৎ করতে যাননি বরং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া হযরত সা'দকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া সবচেয়ে মজার বিষয় হলো সর্বক্ষেত্রে হজরতে সা'দই আমীরে মুয়াবিকে গালি দিতে শোনেন আর কেও গালি শুনেননি বা সে বিষয়ে বর্ণনা করেননি। তাহলে বলা যেতে পারে আমীরে মুয়াবিয়ার উপর অপবাদ দিতে বার বার হজরতে সা'দের নাম ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া উক্ত বর্ণনায় একই

ঘটনায় মতনের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে তাই এতে সন্দেহ থেকেই যায়।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! উক্ত হাদিস সমূহ ছাড়া হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দেওয়া সম্পর্কে যত হাদিস শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা দলিল স্বরূপ উপস্থাপন করে থাকে তার বেশিরভাগ অংশ মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যায় পূর্ণ এবং কিছু তাদের নিজস্ব গড়া জাল হাদিস, যার কোন ভিত্তি নাই এবং কিছু হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন ও যয়ীফ ও অগ্রহনযোগ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যা জায়গা ও সময়ের সংকীর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করে উল্লেখ করা হলো না। তবে বিস্তারিত জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন ।

অন্যান্য আপত্তি ও তার সঠিক জবাব নিয়ে আলোচনা করা হবে তৃতীয় পর্বে ইনশাআল্লাহ ।

জিকিরের গুরুত্ব

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

পীরজাদা সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
বাসুবাটি বড় হুজুর দরবার শরীফ, হুগলি

আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকের অনেক জায়গায় জিকিরের নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে সেটির ফজিলতও বর্ণনা করেছেন। সব ইবাদতের রুহ হচ্ছে আল্লাহর জিকির। আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সর্বাবস্থায় অধিকহারে তাঁর জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালার সে সব নির্দেশ কয়েকটি আয়াত এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অনুবাদঃ-অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

(সুরা বাকারা: আয়াত ১৫২)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর।' (সুরা আহযাব: আয়াত ৪১)

وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

'আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী নারী ও পুরুষ, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা প্রতিদান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।'

(সুরা আহযাব: আয়াত ৩৫)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

অনুবাদঃ-এবং আপন রবকে নিজের অন্তরে স্মরন করুন সবিনয়ে (কান্না) ও ভীতি সহকারে এবং মুখ থেকে অনুচ্চস্বরে, সকাল-সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ) আর তোমরা উদাসীনদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।' (সুরা আ'রাফ : আয়াত ২০৫)

উল্লেখিত আয়াতে সমূহের আলোকে বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছ থেকে সব সময় তার স্মরণ ও গুণগান পছন্দ করেন। যার কারণে তিনি তাদের গোনাহ মোচন এবং মহা প্রতিদান দানের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

পবিত্র কোরআন কারিমে আল্লাহতায়ালা ৪০ বার জিকিরের কথা বলেছেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদাররা, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো। জিকির বিভিন্ন রকমের বা বিভিন্নভাবে করা যায়। ইস্তেগফারের মাধ্যমেও আল্লাহ তায়ালার স্মরণ বা জিকির করা যায়।

জিকির শব্দের অর্থ স্মরণ করা, বর্ণনা করা ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর স্মরণকে জিকির বলা হয়। জিকির নফল ইবাদত। ইসলামে ফরজের পর নফল ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। কেয়ামতের দিন নফল ইবাদত সওয়াবের পাল্লা ভারি করবে।

জিকির সাধারণত তিন প্রকার।

প্রথমতঃ-জিকিরে লিসানি বা মৌখিক।

দ্বিতীয়তঃ-জিকিরে কালবি বা আন্তরিক স্মরণ তথা মনে মনে স্মরণ।

তৃতীয়তঃ-জিকিরে আমালি বা কার্যত স্মরণ, তথা বাস্তব কর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহকে স্মরণ। তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করাও আল্লাহকে স্মরণ করার নামান্তর।

হজরত আবু হুরায়রা (رضی اللہ عنہ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন যদি বান্দার ফরজের (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'দেখ তো!

আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরজের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে।

(আবু দাউদ ৮৬৪, তিরমিজি ৪১৩, ইবনে মাজাহ ১৪২৫)

অনেকের পক্ষে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত নফল ইবাদত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যেকোনো জায়গায়, যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহর প্রশংসায় তার জিকির করা অনেক সহজ। হাদিসে সহজ এবং সর্বোত্তম জিকির সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا اله الا الله বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা- এটি সর্বোত্তম জিকির। (তিরমিজি, হাদিস:-৫/৪৬২, ইবনু মাজাহ, হাদিস:-২/১২৪৯, হাকিম, হাকিম, হাদিস:-১/৫০৩)

অন্য হাদিসে হজরত আবু হুরায়রা (رضی الله عنه) থেকে বর্ণিত, রাসুল (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা চারটি বাক্য নির্বাচন করেছেন- সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৮০১২)

হযরত আবুযার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথা কি তা জানাব? আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হল, 'সুবহানাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)"

(মুসলিম ২৭৩১, তিরমিযী ৩৫৯৩)

হযরত আবূ মালেক আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও জমিনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়।" (মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭)

এছাড়াও হজরত আনাস (رضی الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে-একবার নবী (ﷺ) গাছের একটি ডাল ধরে ঝাঁকি দিলেন, কোনো পাতা পড়লো না। তিনি আবার ঝাঁকি দিলেন; এবারও কোনো পাতা পড়লো না। তবে তৃতীয়বার ঝাঁকি দেওয়ার পর অনেকগুলো পাতা ঝরলো। তখন নবীজী (ﷺ) বললেন, 'নিশ্চয় সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা- ইলা-হা ইল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা- বান্দার গুনাহ ঝরিয়ে দেয়, যেমন (শীতকালে) গাছ তার পাতা ঝরায়।' -(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ১২৫৩৪)

মিজানের পাল্লা ভারী হয়:-

রাসুল (ﷺ)-এর পশুরক্ষক আবি সালমা (رضی الله عنه) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি শুনেছেন, রাসুল (ﷺ) বলেছেন, বাঃ! বাঃ! পাঁচটি জিনিস মিজানে কতই না ভারী! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ। আর নেক সন্তান, যে মারা গেলে মুসলিম (পিতা-মাতার) জন্য সওয়াব কামনা করে। (ইবনে হিব্বান ৮৩৩)

সর্বোত্তম জিকিরের বর্ণনা:-

সর্বোত্তম জিকির কোনটি তা নিয়ে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে সর্বোত্তম জিকির হলো- কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ কারণ এর দ্বারা অন্তর পরিষ্কার হয়। কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিলাওয়াতে কুরআন হলো সর্বোত্তম জিকির। কেননা এতে একটি হরফে ১০টি নেকি পাওয়া যায়। কোনো রেওয়ায়েতে আছ, তাওবা ও ইস্তিগফার হলো উত্তম জিকির। এতে মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, গুনাহ মাফ হয় ও রিজিকে বরকত হয়। কোনো রেওয়ায়েতে আছে- সর্বোত্তম জিকির হলো দরুদ শরিফ পাঠ। কোনো রেওয়ায়েতে আছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম-এ দোয়াটি সর্বোত্তম জিকির। কেননা এর দ্বারা কিয়ামত দিবসে মিজান ভারী হবে। কোনো রেওয়ায়েতে আছে-উত্তম জিকির হলো তাসবিহে ফাতেমি।

অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার প্রত্যহ বাদ ফজর ও মাগরিব। (মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি,তাফসিরে নঈমি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৬৯)

আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদত করার জন্য। অন্যান্য সৃষ্টিজগৎও আল্লাহর জিকির করে তাদের নিজস্ব ভাষায়। আর জিকির আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং এটি সব সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও বটে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনে জারিকৃত বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে তার স্মরণ এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে জিকির-আজকার, তাসবিহ-তাহলিল আদায় করার তাওফিক দান করুন। জিকিরের মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ ও সফলতা লাভের তাওফিক দান করুন, আমিন।

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিক্বহ শাস্ত্রের পান্ডিত্য দেখে তাজুল উলামা, সৈয়দ শাহ আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ মিঞা কাদরী বারকাতী (সাজ্জাদাহ নশীন কানকাহে মারেহরা মুতাহহারা রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলতেন:

"আমি আলা হযরত রহমতুল্লাহি আলাইহকে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমতুল্লাহি আলাইহির উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। কেননা, যে গভীরতা আলা হযরতের আছে, তা ইবনে আবেদীন শামির মধ্যে নেই।" (ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলমো দানিশ কি নাযার মে, পৃঃ২৬)

প্রশ্নোত্তরে ওযুর ১৫ টি মাসায়েল

মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী (গোয়াস, মুর্শিদাবাদ)

(১) প্রশ্ন-যদি যুকাম (সর্দি লাগার পর যে তরল পানি নাক দিয়ে বের হয়) নাক দিয়ে বের হয়, তাহলে তাতে কি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তরঃ-নাক দিয়ে যুকাম যতই বের হোক না কেন, তাতে ওযু ভঙ্গ হবে না।(ফাতাওয়া রাযাবিয়াহ, খন্ড;১, পৃষ্ঠা:৩৪৬)

(২) প্রশ্ন- যদি খালিদাহ্ (একজন মহিলার নাম) নামাযের জন্য ওযু করার পর নিজের শিশুকে দুধ পান করায়, তাহলে দুধ পান করানোর কারণে কি তার ওযু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তরঃ-শিশুকে দুধ পান করানোর কারণে ওযু ভঙ্গ হয় না। কেননা, পবিত্র তরল পদার্থ, যা শরীর থেকে অভ্যাসগত (সাধারণ) ভাবে বের হয়,তা দ্বারা ওযু ভঙ্গ হয় না। (ফাতাওয়া ফাক্বিহে মিল্লাত জাদিদ, খন্ড;১, পৃষ্ঠা: ৯৭)

(৩) প্রশ্ন- একজন ব্যক্তির মূত্রনালী দিয়ে কোন ধরনের কোন কিছুর ফোটা বের হলো। সেই ফোটা না ধুয়েই সে ব্যক্তি যদি ওযু করে নামায পড়ে, তাহলে কি তার নামায শুদ্ধ হবে?

উত্তরঃ-প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি মূত্রনালী থেকে ফোঁটা বের হওয়া পর যদি ওযু করে নেয়, তাহলে ওযু করার পর তাকে এটা দেখা উচিত যে, তার মূত্রনালী থেকে বের হওয়া ফোঁটা কাপড় অথবা শরীরে এক দিরহাম-এর বেশি লেগেছে কি-না? যদি এক দিরহামের বেশি শরীর বা কাপড়ে লেগে থাকে,তাহলে সেই জায়গাটা ধৌত করা ফরয। যদি ধৌত বা পবিত্র না করে নামায পড়ে নেয়,তাহলে তার নামায হবে না। আর যদি এক দিরহামের সমতুল্য হয়, তাহলে সেই জায়গাটা পবিত্র করা ওয়াজিব। পবিত্র না করে যদি নামায পড়ে নেয়, তাহলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে অর্থাৎ নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। যদি এক দিরহামের কম হয়,তাহলে পবিত্র করা সুন্নাত। পবিত্র না করে যদি নামায পড়ে নেয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু সুন্নতের পরিপন্থী হবে। তবে নামায পুনরায় পড়ে নেওয়া উত্তম।(ফাতাওয়া মারকাযে তারবিয়্যাতে ইফতা নতুন, খন্ড;১,পৃষ্ঠা;৯৮)

(৪) প্রশ্ন- ওলামায়ে দ্বীন এ বিষয়ে কি বলেন; যাইদ (একজনের নাম)বলে যে, ওযু করার পর মুখ কাপড় দিয়ে মোছা উচিত নয়। কেননা এতে ওযু করার নেকী পাওয়া যায় না।

উত্তরঃ-"ওযু করার পর কাপড় দিয়ে মুখ মুছলে ওযুর নেকী পাওয়া যায় না" এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। তবে হ্যাঁ! উত্তম হচ্ছে এটাই যে, প্রয়োজন ছাড়া যেন না মুছে এবং রাজা ও অহংকারী ব্যক্তিদের মতো ওযুর পরে মুখ না মোছার অভ্যাস যেন না বানিয়ে নেয়। যদি ওযুর পানি মোছে, তাহলে প্রয়োজন ছাড়া যেন শুকিয়ে না ফেলে। কেননা, হাদীসের মধ্যে এসেছে যে,ওযুর পানি ক্বিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লায় রাখা হবে। (ফাতাওয়া রাযাবিয়াহ, খন্ড:১, পৃষ্ঠা; ৩১৩)

(৫) প্রশ্ন- ওযু করার জন্য মিসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্? না সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্?

উত্তরঃ- প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য ওযু করার সময় মিসওয়াক করা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্ মুস্তাহাব। (ফাতাওয়া ফাক্বীহে মিল্লাত খন্ড;১,পৃষ্ঠা;৭৩)

(৬) প্রশ্ন- রোদের তাপে গরম হওয়া পানি দ্বারা উযূ বা গোসল করা সম্পর্কে শরীয়তে কী বিধান রয়েছে?

উত্তরঃ-রোদের তাপে গরম হওয়া পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করা শরীয়তে নিষেধ রয়েছে। কেননা, রোদের তাপে গরম হওয়া পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করলে সাদা দাগ (এক ধরনের রোগ) রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (ফাতাওয়া ফাক্বীহে মিল্লাত, খন্ড;১,পৃষ্ঠা;৭৪)

(৭) প্রশ্ন-ওযু করার সময় মাসাহ্ করার জন্য যদি হাত ভেজা থাকে,তারপরও কি নতুন করে পানি নিয়ে মাসাহ্ করা সুন্নত? না নতুন করে পানি না নিয়ে পূর্বের ভেজা হাত দিয়েই মাসাহ্ করা সুন্নাত?

উত্তরঃ-ওযু করার সময় হাতের ভেজা অবশিষ্ট পানি দিয়ে মাসাহ্ করা এবং হাতে নতুন করে পানি নিয়ে মাসাহ্ করা উভয়ই সুন্নাত। কেননা, হাদিসের পুস্তকে দুই ধরনেরই হাদিস বর্ণিত রয়েছে। (ফাতাওয়া ফাক্বিহে মিল্লাত পুরনো, খন্ড;১ পৃষ্ঠা;৭৪)

(৮) প্রশ্ন-ওযু করার পর নামাযের পূর্বে কথাবার্তা বললে কি ওযু ভেঙ্গে যায় না ওযু করার সময় কথা বললে ওযু ভেঙ্গে যায়?

উত্তরঃ-ওযু করার পর নামাযের পূর্বে কথাবার্তা বললে অথবা ওযু করার সময় কথা বললে ওযু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু ওযু করার সময় অথবা ওযু করার পরে নামাযের পূর্বে জাগতিক অথবা পার্থিব কথাবার্তা বলা উচিত নয়। মুস্তাহাব হচ্ছে এটাই যে, ওযু করার সময় অথবা ওযু করার পর নামাযের পূর্বে জাগতিক কথাবার্তা না বলা। (ফাতাওয়া মুফতীয়ে আজমে হিন্দ, খন্ড:২পৃষ্ঠা: ২২২)

(৯) প্রশ্ন-কেউ যদি সতর খুলে ওযু করে পায়জামা পরে নামায পড়ে, তাহলে কি তার ওযু ও নামায সঠিক হবে?

উত্তরঃ-সতর খুলে ওযু করলে ওযু হয়ে যাবে এবং সেই ওযুতে নামায পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সতর ঢেকে ওযু করা উচিত। ওযু করার পর যদি সতর খুলে যায়,তারপরও পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই।(ফাতাওয়া মুফতীয়ে আজমে হিন্দ, খন্ড:২পৃষ্ঠা: ২২৩)

(১০) প্রশ্ন-ফারযে কেফায়া (যেমন-জানাযার নামায)-এর উযূতে কি ফারযে আইন(যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামায)-এর নামায পড়তে পারবে?

উত্তরঃ-"সাধারণ মানুষের মধ্যে এটা প্রচলিত রয়েছে যে, জানাযার নামাযের ওযুতে অন্যান্য নামায পড়তে পারবে না" এটি একটি ভ্রান্ত এবং ভুল ধারণা,যার কোন অস্তিত্বই নেই। ফারযে কেফায়ার ওযুতে ফারযে আইন নামায পড়তে পারে। (ফাতাওয়া বাহারুল উলুম,খন্ড;১ পৃষ্ঠা;৭০)

(১১) প্রশ্ন-ওযুর কয়টি ফরয রয়েছে!

উত্তরঃ-ওযুর চারটি ফরজ রয়েছে । যথা-
১)থুতনি থেকে নিয়ে কপালের চুল বেরোনোর জায়গা পর্যন্ত এবং এক কানের লতী থেকে নিয়ে অপর কানের লতী পর্যন্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।
২)আঙ্গুলের নখ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা।
৩)চতুর্থাংশ মাথা মাসাহ্ করা।
৪)নখ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা।
উল্লেখ্য যে,একবার করে ধৌত করা ফরয এবং তিনবার করে ধৌত করা সুন্নত। (সংক্ষিপ্ত) (ফাতাওয়া ফাক্বিহে মিল্লাত, খন্ড;১,পৃষ্ঠা: ৭৪)

(১২) প্রশ্ন-ওযুকারী ব্যক্তির শরীরে কোন অঙ্গের কিছুটা অংশ বা তার চেয়ে বেশি কেটে যায় কিন্তু যদি রক্ত বের না হয়,তাহলে কি পুনরায় ওযু করবে? না শুধুমাত্র কাটা অংশের উপরে পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট হবে?

উত্তরঃ-যদি কাটা অংশ থেকে রক্ত না বের হয়, তাহলে পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই এবং কাঁটা অংশেও পানি প্রবাহিত করারও প্রয়োজন নেই। (ফাতাওয়া ফাইযুর-রসূল, খন্ড:১,পৃষ্ঠা:১৬৫)

(১৩) প্রশ্নে-ওযু করার সময় কোন অঙ্গ ধৌত করা বলতে কী বোঝানো হয়?

উত্তরঃ- ওযু করার সময় কোন অঙ্গ ধৌত করা বলতে এটা বোঝানো হয় যে, ওযুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে, সেই সব অঙ্গের প্রতিটি অংশে কম করে দুই ফোঁটা পানি যেন প্রবাহিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র ওযুর অঙ্গ ভিজে যাওয়া বা তেলের মত পানি লাগিয়ে নেওয়া অথবা এক-আধা ফোঁটা পানি বয়ে যাওয়াকে অঙ্গকে ধৌত করা বলে না। এমনটা যদি করা হয়, তাহলে তাতে ওযু বা গোসল হবে না।(ফাতাওয়া ফাক্বিহে মিল্লাত, খন্ড;১,পৃষ্ঠা; ৭৯)

(১৪) প্রশ্ন-হাঁটু বের বা উলঙ্গ হয়ে গেলে কি ওযু ভেঙ্গে যায়?

উত্তরঃ-হাঁটু বের বা উলঙ্গ হয়ে গেলে উযূ ভেঙ্গে যায় না।এমনকি কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁটু বের করে, তবে তাতেও উযূ ভঙ্গ হবে না যদিওবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাঁটু বের করা হারাম। ফাতাওয়া তাজুশ-শরীয়াহ্, খন্ড;৩,পৃষ্ঠ; ৩০)

(১৫) প্রশ্ন-অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাদের কি নামায পড়ার জন্য ওযু করার প্রয়োজন রয়েছে?

উত্তর-অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের নামায পড়ার জন্য ওযু করার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ! উযূ করার অভ্যাস তৈরি করার জন্য উযূ করা উত্তম। (ফাতাওয়া তাজুসশ-শরীয়াহ্,খন্ড;৩,পৃষ্ঠা;৯)

ইলমে আসমাউর রেজালে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিজ্ঞতা দেখে মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ হযরত সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ (কেছোছা শরীফ) রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

" ইলমে হাদীসে সবচেয়ে কঠিন ইলম হল ইলমে আসমাউর রেজাল। আলা হযরতের সামনে যখন কোন সনদ বা সূত্র পড়া হতো এবং বর্ণনা কারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো তখনই তিনি প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জারাহ ও তাদীল- এর যে শব্দ বলে দিতেন, তাক্বরীব তাহযীব ও তাযহীব নামক কিতাব উঠিয়ে দেখা হতো ঠিক সেই শব্দ মিলে যেতো। একেই বলা হয় মজবুত জ্ঞান। এবং ইলমের সাথে পরিপূর্ণ আকর্ষণ এবং অধ্যয়নের বিস্তৃতি।" (মাক্বালাতে ইয়াওমে রেযা, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪১)

সহীহ হাদীস ও তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

মাওলানা হেশামুদ্দিন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

আজ থেকে প্রায় দুই মাস আগে মে মাসের পত্রিকায় দূর্বল হাদীসের সংজ্ঞা ও তার সংক্ষিপ্তাকারে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাদীস কাকে বলে? হাদীস কয় প্রকার ও কি কি? ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছিলাম । কাজেই তা দ্বিতীয়বার বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন মনে করি না।

মনে রাখবেন! মূলত কোনো হাদীসই কখনোই দূর্বল অথবা ত্রুটিযুক্ত হয়না। কেননা পারিভাষিক দিক দিয়ে হাদীস তো নবীয়ে কারীম ﷺ এর বাণীকে বলা হয়। কাজেই নবী কারীম ﷺ এর বাণী কিভাবে দূর্বল বা ত্রুটিযুক্ত হতে পারে। হ্যাঁ! তবে সূত্রের ত্রুটি ও বিচ্যুতির কারণে রূপকভাবে কোন হাদীসকে দূর্বল বলা হয় ।

এবং এটাও মনে রাখবেন! কোনো হাদীসই সরাসরি আমাদের নিকট পৌঁছায়নি, আর তা সম্ভবও নয় । হুযুর ﷺ আল্লাহ্ তা'য়ালার উপদেশ ও আপন বাণী সর্ব প্রথম সাহাবায়ে কেরাম গণের সম্মুখে বিবৃত করেছেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিত্বদের ইরশাদ করেনঃ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ

অর্থ:উপস্থিত ব্যাক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যাক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়

নবীয়ে কারীম ﷺ এর আজ্ঞানুসারে সাহাবা মন্ডলীরা হুযুর ﷺ এর প্রত্যেকটি বার্তা ও বাণী, উপদেশ ও অনুশাসন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেন এবং তাঁরাও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বর্ণনা করতে কোন কৌশল বাকি রাখেননি। এরূপভাবে একের পর এক, একের পর আরেক প্রজন্মের নিকট বর্ণিত হয়ে অবশেষে হাদীস ও বার্তা পৌঁছেছে মুহাদ্দিসীনগণ দের নিকট এবং তিনারা আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় কাগজ ও কলমের মাধ্যমে অমূল্য রত্নগুলি সংরক্ষণ করে উম্মতের প্রতি বড়ই দয়া করেছেন।

সংক্ষিপ্ত স্বরূপ এই ভূমিকার পর আলোকপাত করি মূল বিষয়ের প্রতি যে সহীহ হাদীস কাকে বলে ও তা কয় প্রকার ও কি কি ?

সূত্রের মান অথবা বর্ণনাকারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দিক দিয়ে মূলতঃ হাদীস তিন প্রকার ১) সহীহ , ২) হাসান , ৩) যঈফ অথবা দূর্বল।

সহীহ হাদীস:-ইহা আবার দুই প্রকারের, সহীহ লি-যাতিহি ও অপরটি সহীহ লি-গায়রিহী

সহীহ লি-যাতিহি: আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী তদীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক "নুযহাতুন নাযার শারহে নুখবাতুল ফিকারের" মধ্যে সহীহ লি-যাতিহির সংজ্ঞা করতে গিয়ে বলেনঃ

وخَبَرُ الآحاد بِنَقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبطِ، مُتَّصِلَ السَّندِ، غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذ :هُوَ الصَّحِيحُ لذاته

অর্থ:-যে খবরে ওয়াহিদ অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হয়, বর্ণনাকারী আদিল বা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্তশক্তির অধিকারী হন এবং খবরটি শায কিংবা তার মধ্যে কোনো সূক্ষ্ম ত্রুটি না থাকে, তাহলে এরূপ খবর কে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়।

হুকুম:-এর হুকুম হলো তা মাকবুল অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এর মর্যাদা অন্য প্রকারের তুলনায় বেশি। এজন্য অন্য প্রকারের সাথে বৈপরীত্য দেখা দিলে এটা প্রাধান্য পাবে।

শর্ত:-হাদীস সহীহ লি-যাতিহী রূপে গণ্য হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্তের প্রয়োজন

১. বর্ণনাকারী কে আদিল অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ কারী হতে হবে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী উক্ত শর্ত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেনঃ

والمراد بالعَدْلِ :مَن لَهُ مَلَكَةٌ تَحمِلُهُ عَلى مُلَازَمَةِ التَّقْوى وَالْمُرُوْءَةِ

অর্থাৎ:-উসূলে হাদীসের দৃষ্টিকোণায় আদল্ বা আদালত অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হলো এমন এক গুণের নাম যা তাকওয়া অর্জন এবং ভদ্রতা ও ব্যক্তিত্ব অনুসরণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে ।

এবং তাকওয়ার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেনঃ

والمراد بالتقوى :إجتناب الأعمال السَّيِّئَةِ مِن شِرْكٍ أو فسقٍ أو بِدعةٍ

অর্থাৎ:-তাকওয়া বলা হয় শির্ক, কবীরাহ্ গুনাহ্ এবং বিদআত কর্ম থেকে বিরত থাকা ।

নোটঃ মুত্তাকী বলে পরিগণিত হবার জন্য সগীরাহ্ গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত কি না সে বিষয়ে মতভেদ ও মতানৈক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো, সগীরাহ্ গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকা অনেক সময় মানবীয় আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। তাই তা থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা শর্ত নয়। তবে কোনো সগীরাহ্ গুনাহ্ বারবার করলে তাকে আর মুত্তাকী বলা যাবে না। কেননা, তখন সেটি কবীরাহ্ গুনাহে পরিণত হয়।

২.বর্ণনাকারী কে তাম্মুয যাবত্ অর্থাৎ পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হতে হবে ।

যাবত্ (ضبط) শব্দটি ضَبَطَ يَضْبِطُ ضَبْطًا ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল যার অর্থ "সতর্ক ও মনোযোগ সহকারে সংরক্ষণ করা, হেফাজত করা" ইত্যাদি।

যাবত্ অর্থাৎ সংরক্ষণ। সাধারণত এটি দুই প্রকারের,

i) যাবতে সদর অর্থাৎ বক্ষ বা হৃদয়ে সংরক্ষণ রাখা ।

ii) যাবতে কিতাব অর্থাৎ লিখিতাকারে পুস্তকে সংরক্ষণ করা।

i) যাবতে সদর অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করা : এর সংজ্ঞা করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেনঃ

وهُو أنْ يُثبِتَ مَا سَمِعَهُ بحيثُ يتمكن من استحضاره متى شاء

অর্থ:-শ্রবণকৃত বার্তা বা হাদীস গুলি এমনভাবে মুখস্ত করে স্মরণে রাখা যা প্রয়োজনে উপস্থাপন করতে পারে।

অর্থাৎ এমনভাবে মনে রাখা ও সংরক্ষণ করা যে, যখন ইচ্ছা মুখস্ত শুনিয়ে দিতে পারে।

ii) যাবতে কিতাব অর্থাৎ লিখিতাকারে পুস্তকে সংরক্ষণ করা: এর সংজ্ঞায় তিনি বলেনঃ

وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصَحَّحَهُ إلى أن يُؤَدِّيه منه.

অর্থ:-শ্রবণ করা ও শুদ্ধতা বিবৃত করার সময় কাল থেকে অপরের নিকট হাদীস বর্ণনা করা পর্যন্ত, বর্ণনাকারীর নিকট পুস্তক অর্থাৎ যে কিতাবে হাদীস লিখে সংরক্ষণ করেছেন সুরক্ষিত রাখা।

যাবত্ অর্থাৎ আয়ত্তশক্তির প্রতি সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করার পর তিনি ইঙ্গিত করে বলেনঃ হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হওয়ার জন্য বর্ণনাকারীকে যাবতে তাম অর্থাৎ পূর্ণ আয়ত্ত শক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক

৩. মুত্তাসিলুস সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র অর্থাৎ সূত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন স্তরে বর্ণনাকারীর পতন না হওয়া।

যার সার কথা হল হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারী নিজের শায়েখ তথা শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে আপন ছাত্রের নিকট বর্ণনা করা।

যেমন:ইমাম বুখারী নিজ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ يَقُلْ عَلَىَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"

অর্থ:-আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম, তিনি বলেন আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযিদ ইবনে আবু ওবায়েদ, তিনি হযরত (সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন তিনি (হযরত সালমা) বলেনঃ আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যাক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে

তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারী, ১১০)

উক্ত হাদীসটির সূত্রে ইমাম বুখারীর শিক্ষক থেকে সাহাবী পর্যন্ত চারজন বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা একে অপরের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি মুত্তাসিলুস সনদ তথা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৪. মুআল্লাল (مُعَلَّل) অর্থাৎ সূত্রে কোন ইল্লাত বা দোষ ত্রুটি না থাকা। মুআল্লাল (مُعَلَّل) শব্দটির শাব্দিক অর্থ ইল্লাত যুক্ত অর্থাৎ যার মধ্যে দোষ ত্রুটি থাকে। উসুলে হাদীসের দৃষ্টিকোনায় মুআল্লাল ওই হাদীস কে বলা হয় যার মধ্যে খুব সূক্ষ্ম দোষ বা ত্রুটি নিহীত থাকে এক কথায় বাহ্যিক দৃষ্টিকোণায় হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত সেসব হাদীসকে মুআল্লাল বলা হয়। যেমন

অবিচ্ছিন্ন সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে অথচ হাদীসটিকে মারফু বলা হয়েছে অথচ হাদীসটি মৌকুফ ইত্যাদি ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের হাদীসটির লক্ষ্য করুন,

حَدثنِى أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مَعِيطٍ.

অর্থ:-ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমাকে আমার পিতা হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি (ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল) বলেন, আমার নিকট হুশাইম হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে আবু বিশ্'র সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বলেছেন যে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহসিকতার সহিত কুরাইশর দের তিনজনকে হত্যা করেছিলেন, আল-মুতয়িম ইবনে আদী, আল-নাদ্বর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবু মুঈত। (আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতির রিজাল, হাদীস নং- ৩)

উক্ত হাদীসের সূত্রের প্রতি লক্ষ্যপাত করলে বোঝা যায় সনদ বা সূত্রে তিনজন বর্ণনাকারী :ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শিক্ষক হুশাইম , আবু বিশ্'র ও সাঈদ ইবনে জুবায়ের বিদ্যমান এবং সকলেই সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য । তবুও হাদীসটি কেন মুআল্লাল বা ত্রুটিযুক্ত...?

আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেনঃ যে সাঈদ ইবনে জুবায়ের একজন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি কাজেই কোন হাদীস বর্ণনা করতে গেলে সাহাবাগণ অর্থাৎ যারা সরাসরি হুযুর ﷺ -এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন তিনাদের মাধ্যমের প্রয়োজন হবে।

উক্ত হাদিসটিতে দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সরাসরি হুযুর ﷺ-এর থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন অথচ হুযুর ﷺ-এর সাক্ষাতই লাভ করেননি, নিশ্চয় তিনি অন্য কারো নিকট হইতে হাদীস শ্রবন করে সরাসরি নবী করীম ﷺ -এর দিকে সম্বোধন করেছেন। যা মুহাদ্দিসীনগণে রীতি মালাই সুক্ষ ত্রুটিযুক্ত অর্থাৎ মুআল্লাল

৫. সনদ কিংবা মতন শায না হওয়া । উসুলে হাদীসের পরিভাষায় বিশুদ্ধ মতানুসারে শায ঐ হাদীসকে বলা হয় যার মধ্যে সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তার থেকে অধিকতর বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বৈপরীত্য বা বিরোধিতা করে অর্থাৎ একই হাদীস দুজন ভিন্ন রূপে বর্ণনা করে। (নুযহাতুন নাযার, পৃঃ- ২৫ , মাজলিসে বারাকাত) কিছু মুহাদ্দিসীনের মতানুসারে, যদি সিকাহ্ বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী নিজ বর্ণনায় একাকী হয়ে যায় এবং বর্ণিত হাদীসটির কোন সামঞ্জস্যপূর্ণ বা উপযুক্ততা ও সমর্থনকারী অন্য কোন হাদীস না পাওয়া যায়, সেই সব হাদীসকেও শায বলা হয় । (মোকাদ্দামাতুশ শায়েখ)

কিছু হাদিস শাস্ত্রবিদগণের অভিমত হল যে, যে বর্ণনাকারীর জন্ম থেকে স্মৃতিশক্তি দূর্বল, ধীশক্তি কম এবং তা সর্বাবস্থায় একরকম, এরূপ

বর্ণনাকারীর হাদীস কেও শায বলা হয়। (নুযহাতুন নাযার, পৃঃ- ৭৪ , মাজলিসে বারাকাত)

শাযের প্রকারভেদঃ শায্ সাধারণত দুই প্রকারের হয়

১) সূত্র বা সনদ গত শায্ ও অপরটি ২) মতন গত শায্

সূত্র গত শাযের উদাহরণঃ-সূত্রগত শাযের উদাহরণ সেই হাদীসের সূত্রটির মধ্যে পাওয়া যায় যেটি ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

অর্থঃ-সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্, আমর ইবনে দীনার হইতে, তিনি আওসাজাহ্ হইতে, তিনি ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়কালে মৃত্যু বরণ করেন আগে হাদীস

বর্ণনাকারী আমর ইবনে দীনার উক্ত হাদীসটি সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ , হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও ইবনে জুরাইজ সহ বেশ কয়েকজনকে বর্ণনা করেছেন?

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্ আমর ইবনে দীনার থেকে যা গ্রহণ করে বর্ণনা করেছেন, ইবনে জুরাইজ সহ বাকিরাও তাই বর্ণনা করেছেন (যাকে পারিভাষিক ভাবে মুতাবে' বলা হয়) কিন্তু হাম্মাদ ইবনে যায়েদ একটু ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং নিজ বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নাম না নিয়েই সরাসরি (মুরসাল ভাবে) হাদীস বর্ণনা করেছেন

উক্ত হাদীসের সূত্রগুলোর উপর আলোচনা ও পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইমাম আবু হাতিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ সূত্র দুটির মধ্যে সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ্'র সূত্রটি মাহফুজ ও হাম্মাদ বিন যায়েদের সূত্রটি শায যদিও বা হাম্মাদ বিন যায়েদ একজন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। (ফাতহুল মুগীস শারহে আলফিয়াতুল হাদীস, ইমাম সাখাভী, পৃষ্ঠা নং- ৬)

মতন গত শাযের উদাহরণঃ

এর উপমা এই হাদীসটির মধ্যে পাওয়া যায় যেটি ইমাম তিরমিযী ও আবু দাঊদ আলাইহুমার রাহমা নিজ নিজ শুনানের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন-সূত্র সহকারে নিম্নে হাদীসটি লক্ষ্য করুন

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ.

অর্থঃ-হাম্মাদ বিন যায়েদ আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সালেহ্ থেকে, তিনি আবু হুরায়রাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করে নেয়, তখন সে যেন ডান কাতে (কিছুক্ষন) বিশ্রাম করে নেয়। (তিরমিযী শরীফ)

ইমাম বায়হাক্বী বলেনঃ- উক্ত হাদীসটি মতন গত দিক দিয়ে শায। কেননা, হাম্মাদ ইবনে যিয়াদ সিকাহ্ বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও তার অন্যান্য সঙ্গীদের থেকে ভিন্ন ভাবে হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্র দিয়ে কওলী (অর্থাৎ হুযুর ﷺ-এর বার্তাসূচক বাক্য দিয়ে হাদীস বর্ণনা করা) ভাবে বর্ণনা করেছেন। অথচ হাম্মাদ ইবনে যিয়াদের অন্যান্য সঙ্গীরা হাদীসটি ফে'লী (অর্থাৎ হুযুর ﷺ -এর কার্যকর্ম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করা) ভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যা ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তদীয় গ্রন্থ "আস-শুনানুল কুবরা" এর মধ্যে উল্লেখ করেন।

মুহাদ্দিসীন গণদের ভাষ্যঃ-হাদীসটি সহীহ নয়, তার মানে কি ওটা ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস

কোন হাদীসের সহীহ ও স্বীকার্যতা অস্বীকার করার অর্থ এই নয় যে সেই হাদীসটি দূর্বল অথবা জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট।

হাদীসবিদগণ প্রায়ই হাদীস বর্ণনা করার পর

لا يصح ولا يثبت هذا الحديث

অর্থঃ-হাদীসটি সহীহ নয়, হাদীসটি প্রমাণিত নেই

ইত্যাদি ধরনের ভাষ্য গুলি প্রকাশ করে

থাকেন, কিন্তু খুবই পীড়াদায়ক ও দুঃখের সহিত বলতে বাধ্য, যে হাদীসশাস্ত্র থেকে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যাক্তিরাই এ ধরনের ভাষ্য ও মন্তব্য দেখে খুব সহজে উক্ত হাদীসটির উপর দূর্বলতা ও ভিত্তিহীনতা ও নানান ধরনের হুকুম অর্পণ করতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। যা হাদীসশাস্ত্র বিদগণের নিকট অপাবৃত মূর্খতা ও হাদীসে শাস্ত্রের রীতি নীতি থেকে অজ্ঞতার পরিচয়।

মুহাদ্দিসীন গণদের ভাষ্যঃ-হাদীসটি সহীহ নয়,তার অর্থ এই নয় যে হাদীসটি ভিত্তিহীন বা জাল। হয়তো হাদীসটি সহীহ লি-গাইরিহি বা হাসান বা দূর্বল, অথবা যেই সূত্রে ভাষ্যকারী মুহাদ্দিসের নিকট পৌঁছেছে সেই সূত্রটির বর্ণনাকারী মিথ্যুক আরোপে আরোপিত কাজেই সেই হাদীসটি ভিত্তিহীন বা জাল, তবে সেই হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হাওয়ার কারণে সহীহ ও গ্রহণীয়

বিখ্যাত ধর্মতত্ববিদ ও হাদীসশাস্ত্রবিদ আল্লামা মোল্লা আলী কারী মাক্কী رحمة الله عليه তদীয় পুস্তক "আল-আসরারুল মারফুয়া ফিল আখবারিল মাউযুআ"-এর মধ্যে বলেনঃ

لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ ثُبُوتُ وَضْعِهِ.

অর্থঃ-কোনো হাদীস সহীহ না হওয়ার কারণে সেটি জাল বা ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হবে না।

হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী رحمة الله عليه "আল-আযকার" নামক পুস্তকের তাখরীজে হাদীস করতে গিয়ে বলেনঃ

من نَفِي الصحة لا ينتفي الحسن

অর্থঃ-সহীহ হওয়ার অস্বীকার্যতা করলে তাতে হাসানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়না ।

আসুন একটি উপমা দ্বারা পুরো বিষয়টি একটু বোঝার চেষ্টা করি,

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি সুনানে তিরমিযী'র মধ্যে নামাযের অধ্যায়ে "নামাযে রুকূর সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করা প্রসঙ্গে" ২৫৬ নং হাদীসে একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং তার ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে গিয়ে ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহির একটি ভাষ্য উপস্থাপন করে তিনি বলেন যে,

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ :وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ.

অর্থঃ-ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক বলেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল একবার রাফউল ইয়াদাইন করেছেন, অতঃপর আর কখনো করেননি এ হাদীসটি প্রমাণিত নয়

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! বাহ্যিক দৃষ্টিকোণায় যদিও বা হাদীসটির সহীহ ও স্বীকার্যতা অস্বীকার করেছেন এবং অপ্রমাণিত শব্দ দ্বারা ভাষ্য প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও হাদীসটি কিন্তু সহীহ ও গ্রহণীয় এবং আমলযোগ্য, কাজেই গরিষ্ঠ সংখ্যা উম্মত হাদীসটির প্রতি আমলও করে থাকেন। এর পিছনে কি কারণ রয়েছে...?

উক্ত আপত্তির উত্তর বহু মুহাদ্দিসীন নানান ভাবে দিয়েছেন যার মধ্যে একটি হলো এই যে, উক্ত হাদিসটি যেই সূত্রে ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারকের নিকট পৌঁছেছে সেই সূত্রের ভিত্তিতে হাদিসটি অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রমাণিত। কেনোনা ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৫৬ নাম্বারের ভিত্তিতে উক্ত ভাষ্যটি প্রকাশ করার পর তার পরক্ষণেই ২৫৭ নাম্বারের নামাযের মধ্যে বারবার হস্তদ্বয় উত্তোলন না করার সাপেক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করে বলেনঃ

قَالَ أَبُو عِيسَى :حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

অর্থঃ-ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিসটি হাসান। একাধিক সাহাবাগণ ও তাবেঈনগণ এই অভিমতটিই ব্যক্ত করেছেন। হযরত সুফইয়ান সাওরী ও কূফাবাসীরা উক্ত অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন।

কাজেই সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে উক্ত হাদীসটি যেই সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র নিকট পৌঁছেছে সেই সূত্রটির ভিত্তিতে হাদীসটি অভিযুক্ত ও অগ্রহণযোগ্য।

অতএব কোনো মুহাদ্দিস কোনো হাদীসের সহীহ ও স্বীকার্যতা অস্বীকার করলেই যে হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য হবে তা কোন অটল বিষয় নয় ।

জানাযার নামাযে কি ক্বিরাত আবশ্যিক?

মাওলানা মানিরুল ইসলাম, কালিয়াচক,মালদা
শিক্ষক: মাদ্রাসা গাউছিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়াহ হরিবাটি, কুলি, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন:-জানাযার নামাযে কি ক্বিরাত আবশ্যিক?

উত্তর:-বর্তমান যুগে মতানৈক্যের হার এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে, আজ ফিতনার যুগে জন্ম ও মৃত্যু ছাড়া এমন কোনো বিষয় নেই,যে বিষয়ে মতানৈক্য নেই। জানাযার নামাযে কোনো ক্বিরাত নেই, আছে শুধু আল্লাহর প্রশংসা আর নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা ও মাইয়াতের জন্য দোয়া, এটা একটা সমাধানকৃত মাসআলা। কিন্তু তথাকথিত গায়ের মুকাল্লিদ শায়েখরা এবিষয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে বিতর্কের পর্যায়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, এমন কি তারা দাবী করে বসেছে,যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে ক্বিরাত তথা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তাদের নামাযে জানাযা হবে না। অথচ আল্লাহর নবী ﷺ এর অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম এর জানাযাই উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু কখনো জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন,এর উপমা সহীহ হাদীসের আলোকে পাওয়া যায় না। তাই, ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

لم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

অনুবাদ:-নবী করীম ﷺ থেকে (জানাযার নামাযে) ক্বিরাত প্রমাণিত নেই।

(ফাতহুল ক্বাদীর খন্ড,২ পৃষ্ঠা,১২৫)

আর যেই সমস্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ফাতিহা পড়ার অনুমতি দিয়েছেন,এই হুকুম তাদের জন্য যাদের জানাযার দোয়া মুখস্থ নেই। আর এর প্রতিও হানাফী মাযহাবের আমল বিদ্যমান।

তাই সুপ্রসিদ্ধ হানাফী ফিক্বহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছেঃ

ولا يقرأ فيها القرآن ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا باس به وان قرأها بنية القرأة لا يجوز لانها محل الدعاء دون القراءة كذا فى محيط السرخسى.

অনুবাদ:-জানাযায় ক্বোরআন তেলাওয়াত করবে না। যদি দোয়ার উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি ক্বিরাতের নিয়তে পাঠ করে তাহলে জায়েয হবে না। কেননা, এটা দোয়ার স্থান ক্বিরাত করার না। যা মুহিতে সারাখসী কিতাবে বিদ্যমান। (ফাতাওয়ায়ে আলামগীরী, খন্ড ১ পৃষ্ঠা নং,২২৩)

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো।

এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমল,

প্রথম দলীলঃ

عن عبدالله بن مسعود قال :لم يوقت لنا فى الصلاة على الميت قراءة ولا قول كبر ما كبر الامام وا كثر من طيب الكلام ،رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

অনুবাদ:-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার নামাযে আমাদের জন্য ক্বিরাত ও কোনো উক্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তোমরা তাকবীর পাঠ করো, যখন ইমাম তাকবীর পাঠ করবে, আর বেশি বেশি করে সুন্দর দোয়া পাঠ করো।

এই হাদীসের সমস্ত বর্ণনা ক্বারী বিশুদ্ধ বর্ণনা ক্বারী।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ খন্ড,৩ পৃষ্ঠা নং, ১৩৭ হাদীস নং,৪১৫৩)

দ্বিতীয় দলীলঃ

حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابي الزبير، عن جابر قال :ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر في الصلاة على الميت بشئ

অনুবাদঃ-হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ জানাযার নামাযে পড়ার জন্য কোনো কিছু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেননি। আর না হযরত আবু বকর ও উমার রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা করেছেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খন্ড ৭ পৃষ্ঠা নং ২৫০, হাদীস নং ১১৪৮৫)

অতঃএব উপরোক্ত দলীল গুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে ক্বিরাত বা কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নবী করীম ﷺ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে নবী করীম ﷺ নিজ বাহ্যিক জীবদ্দশায় প্রায় ১৪ ধরনের দোয়া জানাযার নামাযে পড়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। যা সাদরুশ শারীয়াহ্ মোহাম্মাদ আমজাদ আলি আযমী আলাইহির রাহমা আপন পুস্তক বাহারে শারীয়াতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। পাঠকদের পড়ার অনুরোধ রইল।

(বাহারে শারিয়াত খন্ড,১ পৃষ্ঠা নং ৮২৯, থেকে ৮৩৪ পর্যন্ত দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত)

এ বিষয়ে সাহাবীদের আমলঃ-

প্রথম দলীলঃ

حدثنا اسماعيل بن علية، عن ايوب، عن نافع ان ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الميت

অনুবাদঃ-হযরত নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জানাযার নামাযে ক্বিরাত পড়তেন না।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা খন্ড,৭ পৃষ্ঠা নং-২৫৮, হাদীস নং-১১৫২২,, ফাতহুল ক্বাদীর, খন্ড ২, পৃষ্ঠা নং-১২৫,, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং,৫৪৮,, আল ইস্তেজকার, খন্ড,৮ পৃষ্ঠা নং-২৬১ হাদীস নং-৪৯৮)

দ্বিতীয় দলীলঃ

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন পুস্তকে নিজ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

حدثني يحيى عن مالك، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابيه انه سأل اباهريرة : كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة :انا لعمر الله اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله و صليت على نبيه ثم اقول اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك و ان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده.

অনুবাদঃ-হযরত আবু সাঈদ মাকবুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে জানাযার নামায পড়েন? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে শিখিয়ে দিব। প্রথমে তাকবীর পাঠ করে, আল্লাহর প্রশংসা করবে, তারপর নবী করীম ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে,তার পর (মাইয়াতের জন্য) দোয়া পড়বে, "আল্লাহুম্মা আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা কানা ইয়াশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসুলুকা ওয়া আনতা আলামু বিহি। আল্লাহুম্মা ইন কানা মুহসিনান ফাযিদ ফী এহসানিহি ,ওয়া ইন কানা মুসিয়ান ফাতাজাওয়ায আন সাইয়িআতিহি, আল্লাহুম্মা লা,তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফতিন্না বা,দাহু।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক হাদীস নং ৫৪৬ মুসান্নাফে আব্দীর রাজ্জাক খন্ড,৩ পৃষ্ঠা নং,৪৮৮ হাদীস নং,৬৪২৬,, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খন্ড ৭, পৃষ্ঠা নং,২৫২ হাদীস নং ,১১৪৯৫)

তৃতীয় দলীলঃ

حدثنا حفص بن غياث عن اشعث عن الشعبي قال :في التكبيرة الاولى :يبدأ بحمد الله والثناء عليه، والثانية :صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة :دعاء للميت، والرابعة :للتسليم

অনুবাদঃ-হযরত শাআবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (যিনি অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন) বলেন, প্রথম তাকবীরে হাম্‌দ (অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসা) পড়বে, তার পর দ্বিতীয় তাকবীরে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর প্রতি দরুদ শরীফ পড়বে। তার পর মাইয়াতের জন্য দোয়া করবে, তার পর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং,১১৪৯৩)

অতএব, উপরোক্ত হাদীস গুলো থেকে পরিস্কার বুঝা যায়। যে সাহাবায়ে কেরাম জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তেন না। আর সাহাবায়ে কেরাম দ্বীন শিখেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সুতরাং: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তেন না।

এ বিষয়ে, তাবেয়ীদের আমলঃ-

প্রথম দলীলঃ

حدثنا يحيى بن ابى بكير قال :حدثنا محمد بن عبد الله بن ابى سارة قال :سألت سالما فقلت :القراءة على الجنازة؟ فقال :لا قراءة على الجنازة

অনুবাদঃ-তাবেয়ী হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু সারাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি (তাবেয়ী) হযরত সালিম রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে জিজ্ঞেস করলাম যে, জানাযার নামাযে কি কোনো ক্বিরাত আছে? তিনি বলেন, জানাযাতে কোনো ক্বিরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ১১৫৩২)

দ্বিতীয় দলীলঃ

حدثنا معتمر بن سليمان عن اسحاق بن سويد عن بكر بن عبد الله قال :لا اعلم فيها قراءة

অনুবাদঃ-তাবেয়ী হযরত বাকার ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার নামাযে ক্বিরাত আছে বলে আমি জানি না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ১১৫৩০)

তৃতীয় দলীলঃ

ইমাম ইবনে আবু শাইবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো একটা হাদীস সংকলন করেন।

حدثنا وكيع عن سعيد عن عبد الله بن اياس عن ابراهيم وعن ابى حصين عن الشعبى قالا :ليس فى الجنازة قراءة

অনুবাদঃ-বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম শাবী এবং ইমাম ইব্রাহিম নাখঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, জানাযাতে কোনো ক্বিরাত নেই। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং ১১৫২৮)

চতুর্থ দলীলঃ

অনুরুপ ভাবে ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সানায়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,

عبد الرزاق ،عن عثمان بن مطر ،عن قتادة عن ابن المسيب قال :ما نعلم فى الصلاة على الميت من قراءة ولا دعاء شيئا معلوما

অনুবাদঃ-বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, জানাযাতে কোনো ক্বিরাত অথবা, কোনো নির্দিষ্ট দোয়া আছে বলে আমি জানিনা।

(মুসান্নাফে আব্দীর রাজ্জাক, খন্ড ৩ পৃষ্ঠা নং,৪৯২ হাদীস নং,৬৪৩৬)

অতঃএব উপরোক্ত হাদীসের আলোকে দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার হয়ে যায় যে, উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ীগণ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন না। আর আমরা সহজেই বুঝতে পারছি,যে তাবেয়ীগণ দ্বীন শিখেছেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে। সুতরাং: নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণ ও তাবেয়ীগণ কেউ জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন না। তাই আমরাও জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করিনা।

এ বিষয়ে আহলে হাদীসের কিছু আপত্তি ও তার উত্তর :

এ বিষয়ে গায়ের মুকাল্লিদরা কিছু দলীল দিয়ে প্রমাণ করতে চায় যে, জানাযার নামাজে সূরা

ফাতিহা পড়া সাহাবায়ে কেরামের আমল, সেই দলীলগুলোর পর্যালোচনা করলে তাদের প্রতারণা বুঝতে বাকি থাকবে না ইনশাআল্লাহ ।নিম্নে তাদের কিছু আপত্তির জবাব দেওয়া হলো:

আপত্তি :১

জানাযার নামাজের সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত, কেননা হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে,

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال :صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنة

অনুবাদ:-হযরত তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিছনে জানাজার নামাজ আদায় করেছি। তিনি এতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন, এবং বলেছেন, আমি সূরা ফাতিহা এজন্য পাঠ করেছি, যেন তোমরা জানতে পারো যে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৩৫ ্ মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং ১৬৫৪)

আমাদের জবাব :

প্রথমতঃ এখানে সুন্নাত বলতে কার সুন্নাত কে বুঝানো হয়েছে,নবী করীম ﷺ -এর নাকি আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যদি নবীজি ﷺ-এর সুন্নাত দাবি করেন তাহলে বাকি সাহাবী এ সুন্নতের প্রতি আমল করলেন না কেন?

দ্বিতীয়তঃ এটা সাহাবী আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আমল , আরে গায়ের মুকাল্লিদ এর দাবি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল ছেড়ে কোন সাহাবীরা আমল গ্রহণ করা কুফরী।

(হাদীস শার ও খাইর পৃষ্ঠা নং ১৫০)

আর নবী কারীম ﷺ জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়েছেন, এরকম আমল সহীহ হাদিসের আলোকে প্রমাণ নেই।

সুতরাং, এই হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করার তাদের কোন অধিকার নেই।

তৃতীয়তঃএই হাদীসটি বুখারীতে থাকলেও আমল করা যাবে না কেননা, হাদীস মতনের দিক দিয়ে মুযত্বারাব বা বিশৃঙ্খলা পূর্ণ। একই বর্ণনাকারী থেকে একাধিক মতনে বর্ণনা রয়েছে,

এই হাদীসটি সুনানে তিরমিযী হাদীস নং ১০২৭, উল্লেখ রয়েছে কিন্তু হাদিসের শেষের দিকে রয়েছে, انه من السنة او من تمام السنة

অর্থাৎ:-নিশ্চয়ই এটি সুন্নাত অথবা সুন্নাতের পূর্ণতা। একই বর্ণনাকারী সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে انها سنة শুধু তাই নয়, সুনানে নাসাঈ এর বর্ণনায় জোরে সূরা ফাতিহা পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب و سورة و جهر حتى اسمعنا فلما فرغ اخذت بيده فسألته فقال: سنة او حق

অনুবাদ:-হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পিছনে নামায পড়েছি, তিনি সুরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করলেন। আর এতটা জোরে তেলাওয়াত করলেন, যে আমরা শুনতে পেলাম। নামায শেষে আমি তার হাত ধরলাম এবং এ বিষয়ে জানতে চাইলাম। অতঃপর তিনি বললেন এটি হক্ব ও সুন্নাহ। (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ১৯৮৯)

প্রিয় পাঠকগণ: উক্ত হাদীসের প্রতি তাদেরও আমল নেই। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে উচ্চস্বরে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। কিন্তু তাদের কিছু কিছু আলেমদের মত সূরা ফাতিহা আস্তে পড়তে হবে। আর একটা কথা সাহাবীদের মধ্যে জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করার আমল, শুধু হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে পাওয়া যায়। বাকি কোন সাহাবী থেকে সহীহ হাদীসের আলোকে এই আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই হযরত ত্বালহাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সূরা ফাতিহা পাঠ করায় তিনি আশ্চর্য্যিত হয়েছেন।

অতএব: উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়। যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহুর হাদীস আমলযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে কেউ যদি দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলে পড়তে পারে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, ইমামে ত্বহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন।

لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة فى صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة،

অনুবাদঃ-হতে পারে কিছু সাহাবায়ে কেরাম জানাযার নামাযে সুরা ফাতিহা পড়েছেন। তিনারা সানা ও দোয়া মনে করে পড়েছেন, ক্বেরাত মনে করে নয়।

(লামআতুত তানক্বীহ, খন্ড ৪ পৃষ্ঠা নং ১২৯, হাদীস নং ১৬৫৫)

আপত্তিঃ২

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়তেই হবে। কেননা, নাবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন।

عن ابنِ عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب،

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, জানাযার নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন।

(সুনানে তিরমিযী হাদীস নং,১০২৬,, মিশকাতুল মাসাবীহ হাদীস নং,১৬৭৩)

আমাদের জবাবঃ

এই হাদীস খানা মুহাদ্দিসীনে কেরামগণের নিকট সহীহ না। কারণ, এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইব্রাহীম বিন ওসমান রয়েছে, তিনি গ্রহণযোগ্য রাবী না।

কারণ, ইমামে তিরমিযী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি হাদীস খানা উল্লেখ করার পর তিনি নিজেই বলেনঃ

ابراهيم بن عثمان هو ابو شيبة الوسطى منكر الحديث

অনুবাদঃ-বর্ণনাকারী ইব্রাহিম বিন ওসমান হলেন, আবু সাইবা আল ওয়াসেতী, তিনি প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় না, যে নবী কারীম ﷺ জানাযার নামাযে সুরা ফাতিহা পড়েছেন। কেননা, শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন।

احتمال دارد كه بر جنازه بعد از نماز يا پيش از ان بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه الان متعارف است والله أعلم،

অনুবাদঃ-আর এটাও হতে পারে, যে জানাযার নামাযের পরে কিংবা আগে বরকত হাসিল করার জন্য নবী করীম ﷺ সূরা ফাতিহা পড়েছেন। যেমনটা এখনো প্রচলন আছে, আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত। (আশয়াতুল লোময়াত,খন্ড ১, পৃষ্ঠা নং ৩৩২)

আপত্তিঃ ৩

জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। কেননা, নবীজি ﷺ অনুমতি দিয়েছেন।

حدثنا عمر بن ابى عاصم النبيل و ابراهيم بن المستمر قالا حدثنا ابو عاصم حدثنا حماد بن جعفر العبدى حدثنى شهر بن حوشب حدثتنى ام شريك الانصارية قالت :امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب،

অনুবাদঃ-হযরত উম্মে শারীক আল আনসারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪৯৬)

আমাদের জবাবঃ

উক্ত হাদীস খানা দুর্বল, আর সহীহ হাদীস থাকতে দুর্বল হাদীসের প্রতি আমল করা যাবে না।

উক্ত হাদীস দুর্বল হওয়ার কারণঃ

উক্ত হাদীসে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যার নাম হলো, হাম্মাদ বিন জাফর আল আবদী, এই বর্ণনাকারী প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

حماد بن جعفر بن ذيد العبدى ،لين الحديث،

অর্থাৎঃ-হাম্মাদ ইবনু জাফর বিন জায়েদ আল আবাদী: তিনি হাদিস শাস্ত্রে দুর্বল।

(তাক্বরীবুত তাহযীব রাবী নং, ১৪৯২)

উক্ত হাদিসে আরো একজন বর্ণনাকারী আছে,

যার নাম হলো, শাহার বিন হাউশাব, এই বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

شھر بن حوشب الاشعری ... صدوق کثیر الارسال والاوھام

অনুবাদ:-শাহার বিন হাউশাব, তিনি একজন সত্যবাদী , তবে অনেক ইরসালকারী অর্থাৎ তার অধিকাংশ বর্ণনা মুরসাল, আর সে একজন সন্দেহজনক বর্ণনাকারী।

(তাক্বরীবুত তাহযীব রাবী নং ২৮৩০)

উক্ত হাদীসের পর্যালোচনা করার পর পাঠক গণের বুঝতে আর বাকি নেই, যে এই হাদীসের সনদে অনেক আপত্তি রয়েছে, বিধায় এই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

আপত্তি: ৪

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাজে উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পড়েছিলেন।

عن ابن عباس قال :اتی بجنازة جابر بن عتیك او قال :سهل بن عتیك، وكان اول من صلی علیه فی موضع الجنائز ،فتقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم فكبر فقرأ بام القرآن فجهر بها ثم كبر الثانیة فسلم علی نفسه وعلی المرسلین ثم كبر الثالثة فدعا للمیت فقال :اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته، ثم كبر الرابعة فدعا للمؤمنین والمؤمنات ثم سلم

অনুবাদ:-হযরাত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, হযরত জাবির বিন আতিক কিংবা সাহাল বিন আতিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর লাশ হাজির করা হলো, জানাযা স্থানে সর্ব প্রথম তার জন্য দোয়া করা হয়। অতঃপর নবীয়ে করীম ? আগে বাড়লেন,তার পর তাকবীর দিলেন, তারপর তিনি উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন।.....

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৮, হাদীস নং ৪১৫৯)

আমাদের জবাব:

এই হাদীস গ্রহণ যোগ্য নয়। কেননা, ইমাম নুরুদ্দিন হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাজমাউয যাওয়ায়েদ এর মধ্যে এই হাদীস খানা উল্লেখ করার পর বলেন।

رواه الطبرانی فی الأوسط وفیه، یحیی بن یزید بن عبد الملك النوفلی وهو ضعیف،

অনুবাদ:-উক্ত হাদিস খানা ইমামে তাবারানী তার মুজামুল আউসাত গ্রন্থের মধ্যে সংকলন করেছেন। উক্ত হাদীসে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যার নাম ইয়াহিয়া বিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেক নাওফালী, আর সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

আপত্তি: ৫

জানাযার নামাজে সুরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা, হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে

عن اسماء بنت یزید قالت :قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا صلیتم علی الجنازة فاقرءوا بفاتحة الكتاب

অনুবাদ:-হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা জানাযার নামাজ পড়বে, তো সূরা ফাতিহাও পাঠ করবে ।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৭, হাদীস নং ৪১৫৬)

আমাদের জবাব:

ইমামী নুরুদ্দিন হাইসামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ গ্রন্থ মাজমাউয যাওয়ায়েদ এ হাদিস খানা উল্লেখ করার পর বলেন,

رواه الطبرانی فی الكبیر ،وفیه معلی بن حمران ولم اجد من ذكره

অর্থাৎ:-ইমামে তাবারানী নিজ গ্রন্থ মু'জামুল কাবীরে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসের সূত্রে একজন বর্ণনাকারী রয়েছে যার নাম হলো, মুয়াল্লা বিন হুমরান, তিনি (নুরুদ্দিন হাইসামী) বলেন আমি তার জীবনী সম্পর্কে কিছু তথ্য পাইনি। অর্থাৎ মাজহুল বর্ণনা ক্বারী (অপরিচিত)।

আপত্তি:৬

নামাযে জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। কেনোনা,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, لا صلوة الا بفاتحة الكتاب

অর্থাৎ:-সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামাজ হবে না। অতএব, জানাযার নামায ও যেহেতু নামাজ

তাই সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযার নামায ও হবেনা।

আমাদের জবাবঃ

প্রথমতঃ আমরা যখন জানাযার নামাযের পর দোয়া করি, তখন আমাদেরকে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়,যে জানাযার নামায যেহেতু দোয়া,তাই তারপর দোয়া করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যখন জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়,তখন আবার নিজেরাই নামাজ দাবি করে বসে।

আসলে তাদের পুস্তক পড়লে আমার আফসোস হয়,যে মানুষ কতটা নিকৃষ্ট হলে, দ্বিমুখী কথা বলে জাতিকে ধোকা দিতে পারে,এই গাইর মুকাল্লিদ নামক মিথ্যাচারীদের না দেখলে বুঝা যাবে না।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত হাদিস দ্বারা জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কে ওয়াজিব প্রমাণ করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা। কেননা, জানাযার নামায অন্যান্য নামাজের মতো নয়। নামাজে জানাজা হলো রুকু ও সিজদা বিহীন নামাজ।

অতএব: পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ কে ক্বিয়াস করে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কে ওয়াজিব প্রমাণ করা কখনোই কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় হতে পারে না।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেই সঠিক পথ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন। আমীন সুম্মা আমীন বেজাহি সাইয়িদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইতি:

মাওলানা মানিরুল ইসলাম
কালিয়াচক,মালদা
শিক্ষক:-
মাদ্রাসা গাউছিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়াহ
হরিবাটি, কুলি, মুর্শিদাবাদ

আল্লামা (আব্দুর) রহমান আলী খলীফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী আপন কিতাব তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ-এর মধ্যে বলেন:

"ইমাম আহমদ রেযার ইলমে তাখরীজে জবরদস্ত যোগ্যতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি "আর রাওযুল বাহীজ ফি আদাবিত তাখরীজ " রচনা করেন। এ সাবজেক্টে যদি এর পূর্বে কেউ কিতাব রচনা না করে থাকে তাহলে, লেখক (আলা হযরত) কে এই সাবজেক্টের জনক বলা উচিত।" (তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃঃ ১৭)

ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে উত্থাপিত আপত্তি ও তার জবাব

[পর্ব-২]

মওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম

প্রিয় পাঠক আমি পূর্বের মাজমুনে ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে ৬ টি আপত্তি ও তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ইন শা আল্লাহ এই লেখনীতে বাকি কিছু আপত্তির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।

আপত্তি নম্বর-৭

নবী যদি গায়েব জানতেন তো কখনও আল্লাহ তায়ালা নবীকে দিয়ে এটা বলা করাতেন না

وَمَآ أَدۡرِي مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ

অনুবাদ:-এবং আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।

(সূরা আহকাফ আয়াত নং ৯)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে নবী নিজের ব্যাপারে এবং উম্মতের ব্যাপারে জানেননা যে ভবিষ্যতে কি করা হবে। তাহলে তোমরা কি ভাবে নবীর জন্য ইলমে গায়েব এর আক্বীদা পোষণ করো যেটা কুরআন বিরোধী।

জবাব: মূর্খ না হলে এমন একটি মানসুখ ও রহিত আয়াত দিয়ে নবীর ইলমে গায়েব কে কি কেউ অস্বীকার করতো?

এই আয়াত টি নাযিল হওয়ার পর মুশরিক রা খুশি মানিয়েছিল এবং বলেছিল

وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى مَا أَمْرُنَا وَأَمْرُ مُحَمَّدٍ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا وَاحِدٌ، وَمَا لَهُ عَلَيْنَا مِنْ مَزِيَّةٍ وَفَضْلٍ،

অনুবাদ:-লাত ও উজ্জার কসম আল্লার নিকট আমাদের আর মুহাম্মদের বিষয় এক এবং আমাদের উপর তার কোন মর্যাদা ও ফযীলত নেই। (তাফসীরে বাগাবী সুরা আহকাফ আয়াত নং ৯ এর ব্যাখ্যা)

এই ব্যাখ্যা থেকে পরিস্কার হয়ে যায় যে আহলে হাদীসরা যে আয়াত দিয়ে নবীর ইলমে গায়েব কে অস্বীকার করছে আর খুশি পালন করছে সেই আয়াত টি নাযিল হওয়ার পরে মুশরিক রাও খুশি পালন করেছিল। প্রিয় পাঠক তাহলে বুঝে নিন তখনকার যুগের মুশরিকদের সঙ্গে এখনকার যুগের আহলে হাদীসদের মিল কতটা।

প্রিয় পাঠক যে আয়াত টি দিয়ে আহলে হাদীস রা ইলমে গায়েব অস্বীকার করলো সেটি রহিত আয়াত অর্থাৎ নবী পূর্বে জানতেন না কিন্তু পরে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু এরা গোপন করে তাহলে বুঝে নিন এরা নবীর প্রেমিক না নবীর শত্রু।

আসুন জেনে নিই পরে কোন আয়াত টি নাযিল করা হয়েছিল তো তাফসীর এর পুস্তক মনযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে পরে যে আয়াত টি নাযিল করা হয়েছিল সেটি হলো নিম্নের এই আয়াত টি

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ"،

অনুবাদ:-যাতে আল্লাহ্ আপনার কারণে ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের গুনাহ্।(তাফসীরে বাগাবী, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ত্বারী)

লজ্জা করা দরকার আহলে হাদীসদের। যখন তারা আমাদের নিকট দলীল চাই তখন বলে সহীহ হাদীস দাও দুর্বল চলবেনা আর নিজের বেলায় মানসুখ ও রহিত আয়াত দিয়েও কাজ চালায় আফসোস শত আফসোস।

আপত্তি নম্বর-৮

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অনুবাদঃ-নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে কেয়ামতের জ্ঞান ও বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা মায়ের গর্ভে রয়েছে, আর কেউ জানে না কাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন ভূখণ্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাতা, ও সব বিষয়ে খবরদাতা।(সূরা লুকমান আয়াত নং ৩৪)

এই আয়াত থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ ছাড়া কেউ এই পাঁচ প্রকারের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত নয়।

জবাব: এই আয়াতের ভিত্তিতে যদি এটা বলা হয় যে সত্তাগত ভাবে অর্থাৎ কারও জানিয়ে না দেওয়াতে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না তাহলে এটি আমরাও মানি কিন্তু যদি এটি বলা হয় যে আল্লাহ জানিয়েও দেননি তাহলে এটি আল্লাহর উপর মস্ত বড় মিথ্যাচার বলেই ধর্তব্য হবে। কেননা একাধিক হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে নবী এই জিনিসগুলোর মধ্যে একাধিক বিষয়ের খবর দিয়েছেন। আহলে হাদীস রা যেহেতু এটিই বিশ্বাস করে যে এর মধ্যে একটিও জিনিস নবী জানতেন না তাই যদি এর মধ্যে একটিও আমি প্রমাণ করে দিই যে নবী জানতেন তাহলে তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। আসুন হাদীসের আলোকে দেখে নিই আমাদের প্রিয় নবী এই সব বিষয়ে জানতেন কি না

কিয়ামত প্রসঙ্গে নবীর জ্ঞান

আহলে হাদীস দের আক্বীদা হলো নবী মুস্তফা কিয়ামত প্রসঙ্গে জানতেন না। আমি পুরো আহলে হাদীস দলকে চ্যালেঞ্জ করছি যদি হিম্মত থাকে তো নিম্নের হাদীসের জবাব দিক

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

অনুবাদঃ-হযরত হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের প্রতি এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলো মনে রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৬০৪)

এই হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে নবী ক্বিয়ামাত সংক্রান্ত বিষয়েও সাহাবাদের কে খবর দিয়েছেন। এখন নামধারী গণ্ডমূর্খ আহলে হাদীসের দল এই হাদীসের ব্যাপারে কি বলবে?

এবার হয়তো আহলে হাদীস রা আপত্তি করতে পারে যে যদি নবী ক্বিয়ামাত সম্পর্কে জানতেন তাহলে ক্বিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ টি কেন বলে দেননি?

এর উত্তরে আমি অধম বলবো যে নবী নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না আর এই প্রসঙ্গেও আমাদের নিকট আয়াত আছে সেটি নিম্নে দেওয়া হলো وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

অনুবাদঃ-এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না। (সূরা নাজম আয়াত নং-৩)

তাহলে নিশ্চয় আল্লার পক্ষ থেকেই নিষেধ ছিল নইলে তো নবী সেটিও বলে দিতেন। আর আমি আন্দাজে গুলি মারছিনা এটির স্বপক্ষেও আমাদের নিকট দলীল রয়েছে যেমন নিম্নে লক্ষ্য করুন

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

অনুবাদঃ-এবং কাফিরগণ তাতে সর্বদা সন্দেহের উপর থাকবে, যতক্ষণ না তাদের উপর কেয়ামত এসে পড়বে আকস্মিকভাবে, অথবা তাদের উপর এমন দিনের শাস্তি এসে পড়বে, যার ফল তাদের জন্য মোটেই ভালো হবে না। (সূরা হজ্ব আয়াত নং ৫৫)

এই আয়াত থেকে সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে কিয়ামত হঠাৎ ভাবে আসবে। এখন চিন্তা করুন প্রিয় পাঠক নবী যদি নির্দিষ্ট তারিখ বলে দিতেন যে অমুক বছরের অমুক

তারিখে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে তাহলে কি সেটি হঠাৎ হতো? নবী যদি নির্দিষ্ট তারিখ বলে দিতেন তাহলে আল্লাহর এই বাণী টি কি মিথ্যা প্রমাণিত হতো না?

মায়ের গর্ভে কি আছে সেই প্রসঙ্গে নবীর জ্ঞান

কয়েকটি হাদীস পড়ে নিজেদের কে আহলে হাদীস উপাধিতে ভূষিত করা গণ্ডমূর্খদের হাদীস দিয়েই চুপ করিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয় হবে। তাদের দাবী হলো যে মায়ের গর্ভে কি আছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না কিন্তু আমাদের আক্বীদা হলো এই যে আল্লার জানিয়ে দেওয়াতে আমাদের প্রিয় নবী জানতেন।নিম্নে দলীল উল্লেখ করা হচ্ছে তাদের হিম্মত থাকলে জবাব দিবে নইলে নিজের আক্বীদা চেঞ্জ করবে।

وَعَنْ أُمِّ الْفضل بنت الْحَارِث أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ. قَالَ: »وَمَا هُوَ؟« قَالَتْ :إِنَّهُ شَدِيدٌ قَالَ« :وَمَا هُوَ؟« قَالَتْ :رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » :رَأَيْتِ خَيْرًا تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حِجْرِكِ« . فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِي حِجْرِى كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদ:-হযরত উম্মে ফাযল বিনতে হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ রাত্রে আমি মন্দ একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, সে স্বপ্নটা কি? উম্মে ফাযল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তা অতি ভয়ানক। তিনি (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেন, আরে বল না, সে স্বপ্নটা কি? তখন উম্মে ফাযল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি দেখেছি, আপনার দেহ হতে যেন এক টুকরা মাংস কর্তন করা হয়েছে এবং তা আমার কোলে রাখা হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তুমি খুব উত্তম ও চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। ইনশা-আল্লাহ কন্যা ফাতিমা একটি ছেলে সন্তান প্রসব করবে, যা তোমার কোলেই রাখা হবে। অতএব কিছু দিন পর ফাতিমার গর্ভে হুসাইন জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁকে আমার কোলেই রাখা হলো, যেমনটি রসূলুল্লাহ (স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন। (আল মুসতাদরাক লিল হাকিম হাদীস নং ৪৮১৮)

এই হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে নবী মুস্তফা মায়ের গর্ভে কি আছে সেই সম্পর্কেও জানতেন সেই জন্যই তো হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মের খবর দেন।

কাল কে কি উপার্জন করবে সেটি কি আমাদের নবী জানতেন না?

আহলে হাদীস দের আক্বীদা হলো আগামী কালকে কে কি উপার্জন করবে সেটি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। আসুন হাদীসের আলোকে আমরা দেখে নিই যে তাদের এই আক্বীদা টা হাদীস সমর্থিত কি না।

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ

অনুবাদ:-হযরত সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে খায়বার যুদ্ধে যাননি। কেননা তাঁর চোখে অসুখ ছিল। এতে তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যাব না? অতঃপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ্ বিজয় দান করলেন, তার আগের রাতে আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামী কাল ভোরে আমি

এমন এক লোককে পতাকা দিব, অথবা বলেছিলেন যে, এমন এক লোক ঝান্ডা ধারণ করবে যাঁকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসেন, অথবা বলেছিলেন, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। অতঃপর আমরা দেখতে পেলাম তিনি হলেন 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) অথচ আমরা তাঁর সম্পর্কে এমনটি আশা করিনি। তাই সকলেই বলে উঠলেন, এই যে 'আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই দিলেন এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দিলেন।(সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৭০২)

প্রিয় পাঠক এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে নবী মুস্তফা কালকে কে কি উপার্জন করবে সেই সম্পর্কে জানতেন তার জন্যই তো এটি বলেছিলেন যে আগামী কালকে এমন একজন ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করবো যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খায়বারের যুদ্ধে বিজয় দান করবেন। আবারও প্রমাণিত হলো আমাদের আক্বীদা হাদীস সমর্থিত আর আহলে হাদীসদের আক্বীদা হাদীস বহির্ভূত।

কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে সেটি কি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না?

আসুন হাদীসের আলোকে জেনে নিই

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُمَرَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَتَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ وَكُنْتُ رَجُلاً حَدِيدَ الْبَصَرِ فَرَأَيْتُهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي - قَالَ - فَجَعَلْتُ أَقُولُ لِعُمَرَ أَمَا تَرَاهُ فَجَعَلَ لاَ يَرَاهُ - قَالَ - يَقُولُ عُمَرُ سَأَرَاهُ وَأَنَا مُسْتَلْقٍ عَلَى فِرَاشِي . ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالأَمْسِ يَقُولُ "هَذَا مَصْرَعُ فُلاَنٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ" . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

অনুবাদঃ-হযরত আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একদা আমরা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। তখন আমরা চাঁদ দেখছিলাম। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, তাই আমি চাঁদ দেখে ফেললাম। আমি ব্যতীত কেউ বলেনি যে, সে চাঁদ দেখেছে। তিনি বলেনঃ আমি উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলছিলাম, আপনি কি চাঁদ দেখছেন না? এ-ই তো চাঁদ। কিন্তু তিনি দেখছিলেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলছিলেন, অল্পক্ষণের মাঝেই আমি দেখতে পাব। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাদের নিকট বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাফিরদের ঘটনা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। বললেন, আগের দিন বদর যুদ্ধাদের ধরাশায়ী হবার স্থান। রসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দেখাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, ইনশাআল্লাহ্ এটা আগামীকাল অমুকের ধরাশায়ী হবার স্থান। বর্ণনাকারী বলেন, উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, শপথ সে সত্তার, যিনি তাকে সত্য বাণীসহ প্রেরণ করেছেন, রসুলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সীমারেখা বলে দিয়েছেন, তারা সে সীমারেখা একটুও অতিক্রম করেনি। (মুসলিম শরীফ হাদীস নং ২৮৭৩)

প্রিয় পাঠক! এই হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে কে কোথায় মৃত্যুবরণ করবে সেটি আমাদের নবী জানতেন। যদি উনি না জানতেন তাহলে বদরের যুদ্ধে কাফির রা কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে সেটি বলতে পারতেন না। এই হাদীসের ভিত্তিতে আবারও নামধারী আহলে হাদীসদের আক্বীদা বাতিল প্রমাণ হলো আর আমাদের আক্বীদা সত্য প্রমাণিত হলো।

আপত্তি নম্বর-৯

নবী মুস্তফা যদি ইলমে গায়েব জানতেন তো ৭০ জন সাহাবাকে বিরে মায়ুনা নামক স্থানে প্রেরণ করতেন না। কেননা মুনাফিক রা রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য কিছু সাহাবী

চেয়েছিলেন আর নবী দিয়েও দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য খারাপ ছিল। তারা ওই সাহাবাদের শহীদ করে দিয়েছিল তাহলে নবীকে অদৃশ্যের সংবাদদাতা মানলে এই ঘটনা অনুযায়ী নবীকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে কেননা নবী মুস্তফা যদি ওই সাহাবাদের কে প্রেরণ না করতেন তাহলে তিনাদেরকে মুনাফিকরা শহীদ করতে পারতোনা।

জবাব:-আহলে হাদীসরা নিজেদের আক্বীদা কে বাঁচাতে গিয়ে কত টা নিচে নামতে পারে এই আপত্তিটিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। এখন আমি এই মূর্খ আহলে হাদীসদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে বলুন ওই সাহাবাদের কে মুনাফিকরা শহীদ করে দিবে সেটি কি আল্লাহ তায়ালাও জানতেন না? আল্লাহ কেন বলে দিলেন না যে হে নবী আপনি সাহাবাদের প্রেরণ করবেন না কেননা এরা আপনাকে ধোকা দিতে চাইছে। এমনটি তো আল্লাহ তায়ালা করেননি তাহলে আহলে হাদীসরা কি আল্লার ইলমে গায়েবের উপরেও আপত্তি করার দুঃসাহসিকতা করবে?

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নবীকে পাঠানোই হয়েছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য। আর যখন নবীর নিকটে মুনাফিকরা কিছু সাহাবা চাইলো ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের জন্য তো নবী এটা দেখলেন না যে এরা আমার সাহাবাদের শহীদ করে দিবে বরং পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।এমন কাজ করে আমাদের প্রিয় নবী স্বয়ং আল্লার পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করেছেন কেননা আল্লাহ জানতেন যে আমার কিছু নবীকে কাফিরের দলরা শহীদ করে দিবে তবুও আল্লাহ নবী পাঠানো বন্ধ করেননি বরং হত্যাকারীদের ব্যাপারে ভয়ানক শাস্তির কথা বলেছেন যেমন নিম্নে দেওয়া আয়াত টি থেকে বুঝতে পারবেন

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيۡرِ حَقّٖ وَيَقۡتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡقِسۡطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

অনুবাদ:-ঐসব লোক, যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায় ভাবে শহীদ করে, আর ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশদাতাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির!

আপত্তি নম্বর-১০

বুখারী শরীফ এর মধ্যে একটি লম্বা হাদীস আছে সেই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে নবী ইলমে গায়েব জানেন না। ঘটনা টি সংক্ষেপে দিচ্ছি হিম্মত থাকলে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন। নবী মুস্তফা হাউজে কাউসারের নিকট থাকবেন তো কিছু লোক উপস্থিত হবে কিন্তু রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ওই লোকগুলির মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। তখন আমাদের নবী বলবেন এরা তো আমারই অনুসারী, তখন নবীকে বলা হবে

إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ

অনুবাদ:-আপনি নিশ্চয়ই অবহিত নন যে আপনার পরে এরা দ্বীনের মধ্যে কি পরিবর্তন করেছে। (বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৫৭৪)
তো এই হাদীস থেকে পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে নবী গায়েব জানেন না জানলে কি নবী বলতেন যে এরা আমার অনুসারী।

জবাব:-সত্যি আহলে হাদীসরা এত নিরেট মূর্খ হয় সেটি এই আপত্তি থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে, কেননা ইলমে গায়েব অস্বীকার করার জন্য এমন একটি দলীলের সাহারা নিচ্ছে যেই হাদীস টি থেকে ইলমে গায়েব প্রমাণিত হচ্ছে।

প্রিয় পাঠক একবার নিজের বিবেক কে জিজ্ঞাসা করুন তো যে উপরে উল্লেখিত ঘটনা টি দ্বারা কি নবী মুস্তফার অদৃশ্যের সংবাদ প্রমাণ হয়না? কেননা নবী নিজের জীবদ্দশায় এমন ঘটনা সম্পর্কে সাহাবাদের কে বলছেন যেটি হাউজে কাউসারের নিকট ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে তো নবীর অদৃশ্যের সংবাদের এর থেকে বড় দলীল আর কি হতে পারে।

এখন আপনাদের মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন হয়তো থেকে যাবে সেটি হলো তাহলে নবী মুস্তফা তাদেরকে নিজের অনুসারী বলবেন কেন? তো এর উত্তরে আমি বলবো যে তাদের কে চরমভাবে অপমান করার জন্য কেননা প্রথমে অনুসারী বলে

ডেকেছেন পরে নিজেই বলেছেন

"سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي"

অনুবাদঃ-যারা আমার পরে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক, দূর হোক।

আর একটি কথা আশা করি বুঝতেই পারছেন যে কাউকে যদি আমি দাওয়াত না দিই তো সেটি অত টা অপমানজনক নয় যতটা অপমানজনক দাওয়াত দিয়ে বিতাড়িত করা।

প্রিয় পাঠক! আমাদের কে আক্বীদা রাখতে হবে যে আমাদের প্রিয় নবী সমস্ত উম্মতের সম্পর্কে অবগত আছেন এবং হাশরে নবী চিনতেও পারবেন যে কে কেমন ধরনের উম্মত আর এটির স্বপক্ষে আমাদের নিকট একাধিক দলীল রয়েছে শুধু মাত্র নিম্নে মাত্র একটি দলীল দিচ্ছি মাজমুনের দীর্ঘতার আশঙ্কায়

"فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ". قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ

অনুবাদঃ-সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন?

তিনি বললেন, "কেন, যদি কোন ব্যক্তির সাদা রঙের কপাল ও সাদা রঙের হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তারা (আমার উম্মত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, ওযুর ফলে তাদের মুখমণ্ডল, হাত-পা জ্যোতির্ময় হবে।

এই হাদীস থেকে সূর্য্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী নিজ উম্মতদের কে চিনতে পারবেন।

আশরাফ আলী থানবী বলেনঃ

"আমার যদি সুযোগ হতো মোলভী আহমদ রেযা খান বেরেলভীর পিছনে নামায পড়ে নিতাম।"

(উসউয়া-ই-আকাবির, পৃষ্ঠা ১৮)

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দীন (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর) বলেন:

"নিজ দেশে (ভারতবর্ষে) আহমদ রেযার মতো এত বড় বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় অপচয় করেছি।"

হুযুর আলা হযরতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
ফলতা, দঃ২৪পরগনা, পঃবঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির কল্যাণার্থে ও তার গন্তব্যস্থলের পথ অতিক্রম করার জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানার্থে ও তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে অসংখ্য নবী ও রসূলগণকে এই ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন অবশেষে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সর্বশেষ নবী করে পাঠিয়ে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন কিন্তু নবী ও রসূলগণদের মহান কাজ ও তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্য আউলিয়ায়ে কেরামদের দল কে বেছে নিয়েছেন যাহারা কখনো সাহাবী রূপে আবার কখনো তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ী রুপে,ও কখনো মুজাদ্দিদ, ওলী ও আল্লাহর নেক বান্দার রূপে সেই মহান দায়িত্ব কে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হওয়া থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খুব সুন্দরভাবে পালন করে আসছেন তন্মধ্যেই অন্যতম ব্যক্তিত্ব হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহির যিনি সবার মাঝে আলা হযরত নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, বড় আলিমে দ্বীন, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুনাযীর্ব দার্শনিক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, কবি, কলম সম্রাট, বহু সুন্নত জীবিতকারী ও বহু বিদাতের বিনাশকারীর সঙ্গে সঙ্গে বহু পুস্তকের লেখক গবেষক ও একজন আল্লার নৈকট তো লাভকারী বান্দা ও ওলী ছিলেন। এই লেখনীর মাধ্যমে তাঁরই সংক্ষিপ্ত জীবন সম্পর্কে অবগত হব ইনশাআল্লাহ ।

শুভ জন্মঃ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী, ১৪ই জুন ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শনিবার ভারতের (ইউপি) বেরেলী শহরের যাসুলি নামক মহল্লায় যোহরের সময় জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম বৎসর হিসাবে তার ঐতিহাসিক নাম আল মুখতার (১২৭২ হি:)

তিনি পবিত্র কোরআন মাজীদের ২৮ পারা সূরাতুল মুজাদালার ২২ নম্বর আয়াত

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

অনুবাদঃ-এরা ঐসব লোক যাদের অন্তরগুলিতে আল্লাহ ঈমান অংকিত করে দিয়েছেন এবং তার নিকট থেকে রুহ দ্বারা তাঁদের সাহায্য করেছেন।) থেকে আরবি সংখ্যাতাত্বিক গাণিতিক সূত্রের মাধ্যমে (ইলমে আবজাদ) স্বীয় জন্ম সাল ১২৭২ হিজরী বের করেছেন।

বংশ পরিচয়ঃ

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহির পিতার নাম মাওলানা নাক্বি আলি খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি নিজের যুগের বিখ্যাত একজন আলীমে দ্বীন গবেষণা ও বহু পুস্তকের প্রণেতা ছিলেন এবং আলা হযরতে দাদার নাম মাওলানা রেজা আলী খাঁন রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একজন বড় আলিমে দ্বীন ছিলেন। আলা হযরতের বংশের পূর্বপুরুষগণ আফগানিস্তান কান্দাহারের এক সম্মানীয় গোত্র বাড়াইচের পাঠান ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পূর্বপুরুষ জনাব শাহ সাইদুল্লাহ খাঁন মোগল আমলে প্রথমে করাচি হয়ে দিল্লি ও তারপর বেরেলী শহরে আসেন পরে এখানকার বাসিন্দা হয়েই থেকে যান ।

নাম করণ আলা হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহির

ঐতিহাসিক নাম আল মুখতার (১২৭২হিঃ) এবং তাঁর পিতামহ হযরত মাওলানা রেযা আলি খাঁন তাঁর নাম মোহাম্মদ আহমদ রেযা খাঁন রাখেন। তাঁর মহিয়সী মাতা পরম স্নেহের সাথে ডাকতেন আমান মিয়া ও পিতা ডাকতেন আহমদ মিয়া বলে। রাসুল প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তিনি নিজের নামের পূর্বে আব্দুল মোস্তফা সংযোজন করতেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

তিনি ১২৭৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মাত্র চার বছর বয়সে পবিত্র কোরআন শরীফ নাজরা সম্পূর্ণ করেন। এরপর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন তাঁর সম্মানীয় পিতা তত্ত্ববোধনেই। এছাড়া যে সকল শিক্ষকগণের কাছ থেকে তিনি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তন্মধ্যে মাওলানা আব্দুল আলীম রামপুরী ও মাওলানা মির্জা গোলাম বেগ প্রমুখ অন্যতম। ১২ই রবিউল আউয়াল ১২৭৮ হিজরী পবিত্র জাশনে ঈদ মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে আয়োজিত মহাসমাবেশে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়ে সকল আলোচক ও শ্রোতাকে হতবাক করে দেন। ৮ বছর বয়সেই আরবি ব্যাকরণের বিখ্যাত গ্রন্থ হেদায়াতুন্নুহ পাঠ সমাপ্ত করেন এবং আরবিতে তার একটি শারাহ (ব্যাখ্যা) ও লেখেন। এই হিসাবে এটাই তার সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক। আরো বিস্ময়ের বিষয় হলো মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করে ১২৮৬ হিজরী ১৮ ৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই সাবান দস্তারে ফজিলত লাভ করেন। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় যে যে দিনে তিনি শেষ বর্ষ সনদ লাভ করে সেদিনই তিনি বালক হন এবং সেদিনেই তিনি স্তন্যদান সম্পর্কিত একটি জটিল বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন। ফতোয়া প্রদানে তাঁর এই দক্ষতার পরিচয় পেয়ে তাঁর পিতা মওলানা নাক্বি আলী খাঁন ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব তাঁকে দিয়ে দেন।

গণিত শাস্ত্রে আ'লা হযরতের পারদর্শিতা

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। তিনি কমবেশি ৫০ টির অধিক বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং নামিদামি পুস্তক রচনা করেছেন। প্রতিটি শাস্ত্রে তিনি দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন। সময় নির্ণয় বিদ্যায় তিনি এতই পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যে, দিনের বেলায় সূর্য এবং রাত্রি বেলায় নক্ষত্র দেখে তিনি নির্ভুলভাবে সময় নিরূপণ করতে পারতেন। এতে কখনও এক মিনিটেরও কমবেশী হত না। গণিত শাস্ত্রে তিনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, আলিগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়া উদ্দিন, যিনি গণিত শাস্ত্রে বিদেশী ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং স্বর্ণ পদকও লাভ করেছিলেন। একদা কোন এক গাণিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবারে হাজির হন। আ'লা হযরত তাঁকে বললেন: "আপনার প্রশ্নটা বলুন।" তিনি বললেন: "প্রশ্নটা এতই জটিল যে, এ অবস্থায় সহজভাবে তা বলা যাবে না।"আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তখন বললেন: "তাহলে বিস্তারিতভাবেই বলুন। " ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আ'লা হযরত কে প্রশ্নটা বিস্তারিত বললেন। প্রশ্নটা শুনে আ'লা হযরত সাথে সাথেই তার সন্তোষ জনক উত্তর দিয়ে দিলেন। তাঁর উত্তর শুনে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব কিছুক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে বললেন: "হযরত! আমি এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য জার্মান যেতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু একজন আপনার নিকট আসতে বলাই আমি আসলাম আপনার উত্তর শুনে মনে হচ্ছে, আপনি সমস্যাটার সমাধান যেন বইতে নিজ চোখে দেখতে পাচ্ছেন।"তাঁর এই জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যক্তিত্বে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, মুখে দাড়ি রেখে দিলেন এবং নামায রোযার অনুসারী হয়ে যান।

এক মাসে পবিত্র কোরআন শরীফ মুখস্থ

হযরত সায়্যিদ আইয়ুব আলী সাহেব বর্ণনা করেন: "একদিন আ'লা হযরত বলেন: "আমার সম্পর্কে কিছু অনবহিত লোক আমার নামের আগে হাফেজ লিখে থাকেন, অথচ আমি পবিত্র কুরআনের হাফেজ নই।" তিনি আরও

বর্ণনা করেন, "যেদিন আ'লা হযরত এ কথা বলেছেন: সেদিন থেকে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ মুখস্থ করা শুরু করে দেন এবং ইশার নামাযের জন্য অযু করার পর থেকে জামাআত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি কুরআন শরীফ মুখস্থ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে নেন। এভাবে তিনি দৈনিক এক পারা করে মাত্র ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারা কুরআন শরীফ হিফজ করা শেষ করেন। এক জায়গায় তিনি বলেন যে, আমি কুরআন শরীফ ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুখস্থ করি আর তা এজন্য যে, ঐসব আল্লাহর বান্দার কথা (যারা আমার নামের আগে হাফেজ লিখে দেয়) যেন ভুল প্রমাণিত না হয়।

রসুলের প্রতি অগাধ ভালবাসা

আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান-প্রাণ দিয়ে খুবই ভালোবাসতেন তিনি বলতেন যদি কেউ আমার কলিজাকে দুই টুকরো করে দেয় তাহলে এক টুকরো তে (لا الله الا الله) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর অপর টুকরোতে (محمد رسول الله) মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লিখিত পাবে । প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় লেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থে হাদায়েকে বখশিশের প্রতিটি চরণ রসুলের প্রতি তাঁর নজিরবিহীন অগাধ ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করে। যা এই সংক্ষিপ্ত লেখনীর মাধ্যমে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

রচনাবলী

আলা হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহি বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক হাজারেরও বেশী কিতাব রচনা করেছেন। তিনি ১২৮৬ হিজরী থেকে ১৩৪০ হিজরী পর্যন্ত লাখো ফতোয়া দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! তাঁর লিখিত সমস্ত ফতোয়া গ্রন্থাকারে এখনো ছাপা হয়নি। আর যেগুলো গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছে, তার নামকরণ করা হয়

الْعَطَايَا النَّبَوِيهِ فِي الْفَتَاوَى الرَّضَوِيَّة

(আল আতায়ান নাবাবিয়্যাহ ফিল ফাতায়ার রাযাবিয়্যাহ) তাঁর লিখিত ফতোয়ায়ে রাযাবিয়্যাহ (নতুন সংস্করণ) ৩০ খন্ড, যার সর্বমোট পৃষ্ঠা: ২১৬৫৬, সর্বমোট প্রশ্ন-উত্তর ৬৮৪৭টি , ও সর্বমোট রিসালা হল ২০৭ টি ।তিনি তাঁর লিখিত প্রতিটি ফতোয়াকে কুরআন হাদীসের অগণিত দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন। কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, মানতিক ও ইলমে কালাম ইত্যাদিতে তিনি যে অসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তা তাঁর লিখিত ফতোয়া পড়লে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

কোরআন শরীফের অনুবাদ

আলা হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহি কোরআন শরীফের যে অনুবাদ উর্দু ভাষায় করেছেন তা বর্তমানে সময়ে উর্দু ভাষার সমস্ত অনুবাদের থেকে ভিন্ন ও শীর্ষস্থান অধিকারকারী যার নাম কানযুল ঈমান রেখেছেন ।তাঁর বিশিষ্ট খলিফা, সদরুল আফাযিল মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "খাযায়েনুল ইরফান" নামে এবং প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহি "নূরুল ইরফান" নামে প্রান্ত টিকা লিখেছেন।

ইন্তেকাল

আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর ইন্তিকালের চার মাস বাইশদিন পূর্বে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ দিয়ে পবিত্র কুরআনের ২৯ পারার সূরা দাহরের ১৫নং আয়াত

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ

আর (সেবকগণ কর্তৃক) তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যের পাত্রে এবং (পরিচ্ছন্ন) স্ফটিকের পানপাত্রে) থেকে তাঁর ইন্তিকালের বছর বের করেন। সে আয়াতটির ইল্মে আবজদ অনুসারে সংখ্যা হয় ১৩৪০।

২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী অনুযায়ী ২৮শে অক্টোবর ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ রোজ জুমাবার ভারতীয় সময় বেলা ২টা ৩৮ মিনিটে ঠিক জুমার আযানের সময়,ইমামে আহলে সুন্নাত, শাহ্ ইমাম আহমদ

রযা খাঁন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ নশ্বর জগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ:

তাঁর নূরানী মাজার শরীফ বর্তমানে বেরেলী শরীফে অবস্থিত। যা এখনও পর্যন্ত তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের জেয়ারত গাহ ও সমাগমে পরিণত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক, আর তাঁর সদকায় আল্লাহ আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক ।

آمین بجاہ النبی الأمین صلی اللہ تعالٰی علیہ وآلہ وسلم

আল্লামা (আব্দুর) রহমান আলী খলীফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী আপন কিতাব তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ - এর মধ্যে বলেন:

"ইমাম আহমদ রেযার ইলমে তাখরীজে জবরদস্ত যোগ্যতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি "আর রাওযুল বাহীজ ফি আদাবিত তাখরীজ " রচনা করেন। এ সাবজেক্টে যদি এর পূর্বে কেউ কিতাব রচনা না করে থাকে তাহলে, লেখক (আলা হযরত) কে এই সাবজেক্টের জনক বলা উচিত।" (তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃঃ ১৭)

হায়েয ও নেফাস সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী, বীরভূম।

হায়েয আরবি শব্দ, হায়েযের আভিধানিক অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া। সাবালিকা হওয়ার পর স্বভাবগত ভাবে নারীদের জরায়ু থেকে রোগব্যাধি বা বাচ্চা প্রসবের কারণ ব্যতিরেকে স্বাভাবিক নিয়মে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকেই ইসলামিক পরিভাষায় "হায়েয" বলা হয়। হায়েয মানুষের একটি প্রাকৃতিক জিনিস। নারীদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ এই জন্যেই রক্ত সৃষ্টি করেছেন যে, গর্ভে থাকা বাচ্চা তা খাবার হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। প্রস্রাবের পর এ রক্তই নারীর স্তনে দুধ হিসেবে রূপান্তরিত হয়। নারী গর্ভবতী বা দুগ্ধ দানকারিণী না হলে গর্ভাশয়ে সৃষ্ট রক্ত ব্যবহৃত হওয়ার কোনো স্থান থাকে না, তাই তা নির্দিষ্ট সময় জরায়ু দিয়ে নির্গত হয়। হায়েয কে আমাদের দেশে ঋতুস্রাব, মাসিক ও পিরিয়ড ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

হায়েয কখন আসে এবং তার সময়সীমা :-

হায়েয আসার বয়স কমপক্ষে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোনো নারীর রক্তস্রাব হয় তাহলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না বরং তা ইস্তেহাযা (রোগব্যাধি) হিসাবে গন্য হবে। সাধারণত পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত নারীদের হায়েয এসে থাকে। যদি পঞ্চান্ন বছরের পর রক্তস্রাব আসে তাহলে হায়েয হিসাবে গণ্য করা হবে না। তবে এ বয়সে রক্তের রং যদি গাঢ় লাল অথবা কালচে কাল হয় তাহলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

হায়েযের সময়কাল কমপক্ষে তিন দিন তিন রাত এবং সর্বাধিক দশ দিন দশ রাত। তিন দিন তিন রাতের কম রক্তস্রাব হলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে দশ দিন দশ রাতের অধিক রক্তস্রাব হলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না। বরং "ইস্তেহাযা" হিসাবে বিবেচিত করা হবে। যা সাধারণত কোনো না কোনো রোগের কারণে হয়ে থাকে,এর হুকুম হায়েযের হুকুম থেকে ভিন্নতর।

(ফাতওয়ায়ে আলমগীরী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬-হেদায়া প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২-৬৩)

হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে সাদা রঙ ব্যতীত যে কোন রঙেরই রক্ত আসুক না কেন অর্থাৎ লাল, হলুদ, সবুজ, কালো, ধূসর সবই হায়েয হিসাবে গণ্য হবে। (ফতওয়ায়ে আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

হায়েয সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলঃ

মাসআলাঃ-হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত অর্থাৎ পূর্ণ বাহাত্তর ঘন্টার চেয়ে এক মিনিটও যদি কম হয় সেটা হায়েয নয়। হায়েযের অধিক সময় সীমা হল দশদিন দশরাত। (বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালাঃ-বাহাত্তর ঘন্টার সামান্য আগেও যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায় সেটা হায়েয নয় বরং ইস্তেহাযা তবে সকালে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে যদি শুরু হয় এবং তিনদিন তিনরাত পূর্ণ হওয়ার পর সূর্য উদিত হওয়া মাত্রই বন্ধ হয়ে যায় তখন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। এবং এ অবস্থায় বাহাত্তর ঘন্টা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নেই। অবশ্যই অন্য কোন সময় শুরু হলে ঘন্টা হিসেবে গণ্য করা হবে এবং চব্বিশ ঘন্টায় একদিন একরাত গন্য করা হবে। (বাহারে শরীয়ত)

মাসয়ালা:-দশদিন দশরাত থেকে কিছু অধিক সময় রক্ত আসে এবং এ ধরণের প্রথমবার হয়ে থাকে তাহলে দশদিন পর্যন্ত হায়েয গণ্য হবে এবং পরেরটা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি পুর্বে হায়েয এসে থাকে এবং, নিয়ম যদি দশ দিনের কম হয় তখন নিয়মের অতিরিক্ত যতটুকু হবে, তা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

উপমা স্বরূপ:-আগে পাঁচদিনের অভ্যাস ছিল পরবর্তীতে দশ দিন হল, তখন সম্পূর্ণ সময়টা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বারো দিন হয়, সেইক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ দিন হায়েযের অন্তর্ভুক্ত হবে, বাকী সাত দিন ইস্তেহাযা। তবে যদি এক অবস্থায় স্থির না থাকে কখনো চারদিন, কখনো পাঁচদিন, সেইক্ষেত্রে গতবার যতদিন হয়েছিল ততদিন হায়েয হিসেবে গণ্য হবে, বাকীগুলি ইস্তেহাযা।

মাসয়ালা:-গর্ভবতী মহিলার যদি রক্ত আসে তাহলে সেটা ইস্তেহাযা অনুরুপ ভাবে প্রসবের সময় অর্ধেকের বেশি বাচ্চা বের হওয়ার পুর্বে যে রক্ত আসে সেটাও ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে।

মাসয়ালা:-হায়েয সেই সময় থেকে গণ্য করা হবে যখন রক্ত জরায়ু থেকে নির্গত হবে। যদি কোন কাপড় লাগিয়ে রাখার কারণে রক্ত অঙ্গ থেকে বের না হয়, ভিতরেই আটকে থাকে সেইক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত কাপড় বের করে না নিবে ততক্ষণ পর্যন্ত মহিলা অপবিত্র হবেনা। সে নামায, রোযা সবই করবে।

মাসয়ালা:-হায়েযের রং ছয়টি। যথাক্রমেঃ কালো, লাল, সবুজ, খয়েরী, কাদা ও মাটিয়ালী রং। সাদা রং এর যে লালা বের হয় সেটা হায়েয নয়।

নিফাসের সংজ্ঞা:-বাচ্চা প্রসবের স্ত্রীলোকের জরায়ু থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় সেটিকে ইসলামী পরিভাষায় 'নেফাস' বলা হয়। (হিদায়া, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৯)

নিফাসের সময়কাল:-নিফাসের সময়কাল সর্বাধিক চল্লিশ দিন। কিন্তু কমের নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। সন্তান প্রসবের পর যদি কোনো মহিলার রক্তস্রাব না হয়, তবুও তার গোসল করা ওয়াজিব। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

গর্ভপাত হওয়া অবস্থায় সন্তানের অঙ্গ গঠন হয়ে থাকলে, যে রক্তস্রাব আসে তা নিফাসের রক্ত বলে গণ্য হবে। চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হলে প্রথম সন্তানের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন নিফাসের সময় গণ্য হবে এবং বাকীদিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি সেটি প্রথম সন্তান না হয় এবং নির্দিষ্ট অভ্যাস থাকে তাহলে তার অভ্যাসের দিনগুলো নিফাসের দিন হিসেবে পরিগণিত করা হবে। বাকী দিনগুলো ইস্তেহাযা। (ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

নিফাস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল :-

মাসয়ালা:-পেট থেকে সন্তান কেটে বের করা হয় এবং অর্ধেকের বেশি বার হওয়ার পর যে রক্ত বের হবে সেটিও নিফাস।

মাসয়ালা:-যে মহিলার দুজন জমযা সন্তান জন্ম হল। অর্থাৎ দু- জনের মাঝখানের ছয় মাসের কম সময়ের ব্যবধান ছিল, সেইক্ষেত্রে প্রথম সন্তান প্রসবের পর থেকেই নেফাস ধর্তব্য হবে। কিন্তু যদি দ্বিতীয় চল্লিশ দিনের ভিতরে হয় এবং রক্ত আসে তাহলে প্রথম থেকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নেফাসের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইস্তেহাযা বা রোগ তবে যদি চল্লিশ দিন পর প্রস্বব হয়, তখন পরের যে রক্ত বের হবে তা ইস্তেহাযা, নিফাস নয়। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পরেই গোসলের বিধান আরোপিত হবে।

মাসয়ালা:-চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন সময় যদি রক্ত বের না হয়,তবুও সবই নিফাসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যদিও বা পনেরো দিনের ব্যবধান হয়।

মাসয়ালা:-নফাসের রং ঠিক হায়েযের মতোই হয় এবং উভয়ের একই হুকুম।

হায়েয ও নিফাস অবস্থায় মহিলাদের নামায ও রোজা ইত্যাদির বিধান কী?

মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সর্বোচ্চ ৪০ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নামাজকে মাফ করেছেন। কেউ পড়লেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং পরবর্তীতেও এই নামাজ গুলো কাযা করার প্রয়োজন নেই। এবং রোজা রাখা থেকে সাময়িকভাবে ছুটি প্রদান করা হয়েছে। কেউ রোজা রাখলেও আল্লাহ তাআলার নিকটে তা গৃহীত হবে না বরং এই অবস্থায় নামাজ বা রোজা রাখা জায়েয নয়, নামাজ বা রোজা রাখলে গুনাহ হবে। তবে পরবর্তীতে যখন সে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে তখন ছুটে যাওয়া রোজাগুলো সুবিধাজনক সময়ে কাযা করতে হবে এছাড়া এই অবস্থায় ক্বুরআন তেলাওয়াত করা, কাবা শরীফের তওয়াফ করা, মসজিদে যাওয়া, তার সঙ্গে সহবাস করা সব হারাম।

নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো উপস্থাপন করা হলোঃ

হাদিসে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ .

অনুবাদঃ-আবূ সা'ঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ এ কথা কি ঠিক নয় যে, ঋতু প্রারম্ভ হওয়ার সময় মেয়েরা নামায আদায় করে না এবং রোজাও রাখেনা না। (বুখারী শরীফ-১৯৫১)

অন্য হাদিসে এসেছেঃ-

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

অনুবাদঃ-মুআযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: এক জনৈকা মহিলা হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা (রদিয়াল্লহু তা'আলা আনহা) কে জিজ্ঞাসা করল যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা ঋতু চলাকালীন নামাযের কাযা করবে? তিনি বললেন: তুমি কি হারূরা গ্রামের অধিবাসিনী? (জেনে রেখ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা ঋতুগ্রস্ত হতাম, কিন্তু ঐ সময়ের কাযা নামায আদায় করতাম না এবং আমাদের কে উক্ত সময়ের কাযা নামায আদায় করিবার নির্দেশও দেওয়া হতোনা। (আবু দাউদ শরীফ - ২৬২,বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসাঈ)।

প্রশ্নঃ- হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার হুকুম কী?

উত্তরঃ-হায়েয বা মাসিক অবস্থায় সহবাস করা হারাম, জায়েজ বা বৈধ মনে করে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা কুফুরী, কিন্তু অবৈধ বা নাজায়েজ মনে করে করা বড়ো গুনাহ, সহবাসকারির উপর তৌবা ফরজ এবং হায়েযের প্রথম দিকে হয়ে থাকলে এক দিনার (স্বর্ণের এক টাকা) এবং শেষ দিকে হয়ে থাকলে অর্ধেক দিনার (স্বর্ণের অর্ধেক টাকা) আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা মুস্তাহাব।

(বাহারে শরিয়ত, প্রথম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ-সিজার করে বাচ্চা হলে তার নিফাসের হুকুম কী ?

উত্তরঃ-শরিয়তের দৃষ্টিতে সিজার এবং নরমযালে বাচ্চা প্রসবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ উভয়ের একই হুকুম, যেমন-নিফাসের নিম্নর দিকে কোন সময় নির্ধারিত নেই, এক ঘন্টাও হতে পারে, একদিনও হতে পারে বা ১০-১৫ দিনও হতে পারে কিন্তু ৪০ দিনের উর্দ্ধে যাবে না। ৪০ দিন পর যে রক্তটা আসবে সেটা নেফাস নয়। এবং নেফাস অবস্থায়, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, ক্বুরআন তেলাওয়াত করা, কাবা শরীফের তওয়াফ করা, মসজিদে যাওয়া, তার সঙ্গে সহবাস করা সব হারাম।

(বাহারে শরিয়ত ইত্যাদি ফিক্বহ শাস্ত্রের পুস্তক সমূহ)

পীরের কাছে বায়'আত হওয়া কি ওয়াজিব?

মাওলানা কলিমুদ্দীন, মুর্শিদাবাদ

বর্তমান যুগ হল ফিতনা -ফাসাদের যুগ। বিভ্রান্তি, কুফরী, খোদাদ্রোহী, বেধর্মীদের লু হাওয়া বয়ে চলেছে। বেদ্বীনেরা ও লা মাযহাবীরা নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করে ইসলামিক পোশাক পরিধান করে ইসলামিক রুপে আবির্ভূত হচ্ছে। মুসলমানদের প্রতি ঈমান সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি নিজের ঈমানকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে যে নিজেকে কোন এক নির্ভরযোগ্য আল্লাহর ওলি বা খোদাভীরু ব্যক্তিত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করে বায় আত গ্রহণ করবে। কাজেই ইঙ্গিতাকারে আল্লাহ তা'আলা নিম্নক্তের আয়াতের এরশাদ করেন: يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

অর্থাৎ:-যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহ্বান করবো। (পারা নং:১৫,সুরা: বানী ইসরাঈল, আয়াত নং:৭১)

উক্ত আয়াতের অধীনে জগৎবিখ্যাত তাফসীরবিদ হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমাদ ইয়ার খাঁন নাঈমী আলাইহির রাহমা বলেন:

"উক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে দুনিয়াতে কোন এক নেককার ব্যক্তিকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেওয়া উচিত। শরীয়তের ক্ষেত্রে তাক্বলীদ (মাজহাবের ইমামের অনুসরণ) করে এবং ত্বরিক্বতের ক্ষেত্রে বায়আত (কামিল সুন্নি পীরের শিষ্যত্ব) গ্রহণ করে, যাতে হাশর নেককার লোকদের সাথে হয়।"

(নুরুল ইরফান,পৃষ্ঠা নং:৭৫৪, খন্ড নং:২)

বায়'আত কাকে বলে?

বায়'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিক্রি হয়ে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি নেওয়া ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায়:-কোন নির্ভরযোগ্য ও পরিপূর্ণ পীরের হাতে হাত রেখে,পূর্বের সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে,আগামীতে গুনাহ সমূহ পরিত্যাগ করে,নেক আমল সমূহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে সেটিকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেওয়ার নাম হলো বায়'আত। বর্তমান সমাজে যাকে পীর-মুরিদী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

কোরআন শরীফের মধ্যে বায়আত গ্রহণের প্রমাণতা:

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ:-ঐসব লোক যারা আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করছে তারা তো আল্লাহরই নিকট বায়'আত গ্রহণ করছে তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহ তাআলার (কুদরতি)হাত রয়েছে।

(সুরা:ফাতহ,আয়াত নং:১০)

অপর এক আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অর্থাৎ:-নিশ্চয় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন ঈমানদারদের প্রতি যখন তারা ঐ বৃক্ষের নিচে আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করছিলো।

(সুরা:ফাতহ,আয়াত নং:১৮)

উক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে বায়'আত গ্রহণের প্রমাণতা পাওয়া যায়।

হাদীস শরীফ থেকে বায়াত গ্রহণের প্রমাণতা

উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমরা কোন এক বৈঠকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন যে, তোমরা আমার কাছে এ কথার বায়'আত গ্রহণ করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবেনা,এবং কাউকে হত্যা করবে না,যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে (অর্থাৎ কিসাস হিসাবে অথবা হত্যাযোগ্য কোন অপরাধে)। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে তা পূর্ণ করবে, সে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উল্লেখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তাই তার জন্য কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লেখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে।আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।

(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং:৪৩১২)

উক্ত হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন,

এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কেরাম শরীয়ত বিরোধী কর্ম পরিত্যাগ করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছিলেন অতএব এই সংকটময় ফিতনা-ফাসাদের যুগে নিজ ঈমান ও আমল সংরক্ষণের স্বার্থে শরীয়ত ভিন্ন কুকর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য হুজুর স্বাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিনিধি খোদাভীরুদের সঙ্গ লাভ করা অথবা কোন নির্ভরযোগ্য পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা অর্থাৎ মুরিদ হওয়া কর্তব্য।

বায়আত গ্রহণের উপকারিতা:

কোন কামিল পীরের হাতে হাত দিয়ে বায়'আত গ্রহণ করলে (মুরিদ হলে) পীরে কামিলের নৈকট্য অর্জিত হয়, যার সুবাদে অন্তরে শুদ্ধিকরণের সাথে সাথে সৎ কর্মের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি এবং পাপ কর্মের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত হয়। পীরে কামিলের সহচর্য্যের উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল ওয়াহিদ বিন বাশির আলায়হির রহমা বলেন: কামিল আরিফের সহচর্য গ্রহণ করো, তিনি তোমাকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করবেন, তিনার দিদার তোমাকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করিয়ে দেবে, এবং খুব সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তোমার অন্তরকে শোধন করে শয়তানি কুমন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়ে খোদার পথের পথিক বানিয়ে দেবেন, তিনার সহচর্য্যের ফলে তোমার ফরজ ও নফল ইবাদত সমূহ সুরক্ষিত হয়ে যাবে, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কে অধিক স্মরণ করার সম্পদ অর্জিত হবে,এবং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত কর্মে তিনি তোমার সাহায্য করবেন।

(আদাবে মুর্শিদে কামিল, পৃষ্ঠা নং:৮২)

নবম শতাব্দীর মহান ইমাম হযরত আব্দুল ওহ্হাব শারানী এরশাদ করেন: নিশ্চয়ই সমস্ত ইমামগণ ও আওলিয়ায়ে কেরাম নিজের অনুসারীদের সমস্ত কর্মে সাহায্য করেন, যখন মুরিদের রুহ শরীর থেকে বের হয়,এবং মুনকার নাকির তাকে কবরে প্রশ্ন করেন, যখন হাশরে তার হিসাব নিকাশ হবে, পুলসিরাত পাড়ি দিবে,এই সমস্ত জায়গাতে বা অবস্থায় আপন মুরিদকে রক্ষা করবেন। এবং কখনোই তিনারা (আপন মুরিদের প্রতি) অমনোযোগী হন না।

পীর হওয়ার জন্য শর্ত সমূহ:-

কামিল মুর্শিদ অর্থাৎ যার হাতে বায়'আত গ্রহণ করবেন তার মধ্যে এই চারটি শর্ত আছে কিনা অবশ্যই দেখে নেবেন।

১:সুন্নি সহীহুল আক্বিদা হওয়া।

২:ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞান রাখা যেন প্রয়োজনীয় মাসায়েল বলতে পারেন।

৩:কাবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকা।

৪:তার সিলসিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত বা মিলিত থাকা

যার মধ্যে উল্লেখিত চারটি শর্ত না পাওয়া যাবে তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করা যাবে না।

(ফাতওয়ায়ে রাযবিয়া, খন্ড নং:২১,পৃষ্ঠা নং:৪৯১)

হুজুর সাদরুশ শারিয়া হযরত আল্লামা আমজাদ আলী আলাইহির রহমা এরশাদ করেন: মুরিদ হওয়ার পূর্বে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া উচিত,(বর্তমান সময়কালে আবশ্যক বললেও ভুল হবে না) নতুবা যদি বাদ মাযহাব ব্যক্তির হাতে বায়'আত গ্রহণ করে, তবে ঈমান হারাও হতে পারে।

(বাহারে শরীয়ত খন্ড নং:১, পৃষ্ঠা নং:২৭৭)

কোন পীর হতে বিরত থাকবেন:-

১:যার আক্বিদা সুন্নিয়াতের বিপক্ষে।

২:যে ধার্মিক বিষয়ে অজ্ঞ,মাসয়ালা মাসায়েলের জ্ঞান পর্যন্ত রাখে না। কেননা এমন ব্যক্তি তো নিজেই সঠিক-বেঠিক এর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না,কাজেই অপরকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করবে?

৩:যে প্রকাশ্যে কাবিরা গুনাহ করে। যেমন নামাজ পরিত্যাগ করা,দাড়ি কাটা,দাড়ি ছাটা,মহিলাদের থেকে খেদমত নেওয়া ইত্যাদি।

৪:যার সিলসিলা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সম্পৃক্ত বা মিলিত থাকবে না।

উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে দিবালকের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে কোন এক নেককার আল্লাহর ওলির নিকট বায়আত গ্রহণ করতে হবে। এবং উল্লেখিত চারটি শর্ত যার মধ্যে না পাওয়া যাবে তার নিকট বায়আত গ্রহণ করলে দ্বিজগতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

উপসংহার: নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়কাল থেকে বায়আত গ্রহণের এই রীতিনীতি ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে, কাজেই এটি কোন বিদয়াত বা ইসলাম বিরোধী কর্ম নয় বরং পছন্দনীয় কর্ম , ও বৈধ একটি আমল। কোন ওয়াজিব বা আবশ্যক কর্ম নয়।কাজেই কেউ যদি কোন পীরের নিকট মুরিদ নাও হয় তবে কোন প্রকারের গুনাহের অধিকারী হবে না

সুতরাং যদিওবা এটি শরীয়তের মধ্যে কোন আবশ্যক বা ওয়াজিব ও জরুরী বিধান নয় তবুও উপরোক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে তার উপকারিতা বোঝা যায়। কাজেই বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ ঈমান ও আমলের শুদ্ধিকরণ এর জন্য কোন এক নির্ভরযোগ্য খোদাভীরু আল্লাহর ওলির নিকট বায়আত গ্রহণ করা বা মুরিদ হওয়া যুক্তিযুক্ত কাজ।

আশরাফ আলী থানবী বলেন:

"আমার যদি সুযোগ হতো মোলভী আহমদ রেযা খান বেরেলভীর পিছনে নামায পড়ে নিতাম।"

(উসউয়া-ই-আকাবির, পৃষ্ঠা ১৮)

ডঃ স্যার যিয়াউদ্দীন (আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর) বলেন:

"নিজ দেশে (ভারতবর্ষে) আহমদ রেযার মতো এত বড় বিজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় অপচয় করেছি।"

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

2024
August

প্রশ্ন করুন

কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য যোগাযোগ করুন

95546 21297
6296822303
96093 01137

আপনিও লিখুন

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকায় লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে কপি-পেস্ট বা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন

78658 64344
95546 21297
62968 22303

মতামত জানান

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকা আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায়রয়েছে। আপনার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে আপনি মতামত জানাতে পারেন।

62968 22303
95546 21297

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

62968 22303
95546 21297

Designed by: Roushan Ali-9733301647